ঝিলে জঙ্গলে শিকার।

—লেখক—

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্ম্মা,

এম, এ, বি, এল,

Of Linco!d Inn, Barrister-at-Law,
and Advocate, High Court, Calcutta.

লেখকের-ভূমিকা।

আমার শিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী এই পত্রগুলিতে সহজ সরল ভাবে বিবৃত করেছি "শিশুকাল হতে" আমি শিকার ভালবাসি, কর্ম্মজীবনের পরিশ্রমের মধ্যেও সে প্রীতি আমার মন হতে দূর হয়নি। কোন অবসর দিন এ সম্বন্ধে আমার ব্যর্থ যায়নি, বহু কাজের মধ্যে দু এক প্রহরের ছুটী করেও আমি বেরিয়ে পড়েছি। শিকার আমার শুধু চিত্ত বিনোদনের উপায় মাত্র নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রও বটে! এতদ্বারা আমি যে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা ও অভিনিবেশশক্তি অর্জ্জন করেছি তা' আমার জীবন যাত্রার পথে বহু বিষয়ে সহায়ক হয়েছে।

এ চিঠীগুলি আমি আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে লিখেছিলাম। আমার বিচিত্র অনুভূতির এই ইতিবৃত্ত তাঁদের মনে শিকার সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করবে, সে আশা পোষণ করি। ঝিল, জঙ্গল, পশু পাখী চিরদিনই আমায় বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে। যদিও যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি সব কথা বলা হয় নি তবুও ভরসা হয় যাঁরা শিকার ভালবাসেন তাঁদের কাছে এ কাহিনী অপ্রীতিকর হবে না। আর যাঁরা আমার সম-বৃত্তি, মৃগয়াপ্রিয় তাঁরাও এ বিবরণ পাঠে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য লাভ করবেন, কেননা আমার এই স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান বিচিত্র ও বিবিধ, প্রধানতঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ সকলে ও মধ্য ভারতে বহু বৎসর ব্যাপী শিকার-অভিজ্ঞতার ফল।

শিকার ক্ষেত্রে আমি নৈপুণ্য ও সাফল্যের কিঞ্চিৎ যশ অর্জ্জন করেছি; তাই যদি আমার শিকারী বন্ধুদের কাছে এ কাহিনী আদৃত হয়, আমার সন্তানগণ তাদের বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ ও বহুশ্রমলব্ধ মৃগয়া সাফল্যের নিদর্শন শৃঙ্গ চর্ম্মাদি সযত্নে রক্ষা করে, তবেই আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করব।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্ম্মা।

অনুবাদকের নিবেদন।

আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর মূল ইংরাজী হইতে এই শিকার কাহিনী মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহারি হাতে সমর্পণ করিলাম। এ আমার "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।" এ কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রীতিকর হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শিকারী শ্রীকুমুদ নাথ চৌধুরী

শ্রীমতি অলকা　　　বর্গী

শ্রীমান্ কল্যাণ　　　শ্রীমাত করুং

ঝিলে জঙ্গলে শিকার*

৯ই আগষ্ট ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষতঃ ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলা দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনও খানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাঁত স্যাঁত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখনো হাল্কা হয়ে যাবে, এমন কোন সুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে, কত দিনের কত পুরাণ সুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু "পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হয়ে ওঠে না! দু'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শিকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া ব্রতে দীক্ষিত করব কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডি পেরোয়নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময় আমি আমার প্রথম চিতা বাঘ শিকার করি। চিতা বলে মনে কোরনা সেটি ছোট্ট—তা'র রাক্ষস প্রমাণ শরীর! রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছ ত? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হ'ত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ দুন্দুভির হাড়কে হার মানাত! এক রাস কটাশে রোঁয়া! জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়। কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিষও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে তাক ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা! তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম। আহত বন্য জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া করে যাওয়া, শিকারের সব আইনের বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এদের চাল চলন সবই যখন আমার অজানা। "সব ভাল যার শেষ ভাল,"—জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে, ঘরে বসে বসে সেদিনের পাগলামির কথা নূতন করে মনে পড়ছে। সেদিনের সেই অপূর্ব্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসেনি, অনেক সাক্ষীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড় জানোয়ার যা কিছু শিকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই পন্থাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধরণ ধারণ, মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কষ্ট স্বীকার করে এ বিদ্যা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না,

---

* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত "Sports in Jheel & Jungle" নামক ইংরাজী শিকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

হাতে বন্দুকে বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে, আনন্দের উপকরণ হবে। শিকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয় তোমায় অনেক কলকৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারিদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চ্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'তে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, আমি সর্ব্বদা তোমার মনে যে সব জীব, জন্তু, পাখী দেখতে পাও, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নাই) অনেকবার হাতীর উপর চড়ে স্নাইপ (Snipe) শিকার দেখেছ। যখনই ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলে বয়সের অদম্য উৎসাহে, চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ। তবু তোমরা এখন জান, স্নাইপ (কাদাখোঁচা) কত অল্প সময়ের জন্যে বাঙ্গলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, চোখের চেয়ে কাণ যেখানটিতে থাকে,সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরোগ কাদাখোঁচা ছাড়া আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের এখনও জানতে বাকী আছে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধ হয় শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছুবে।তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে যার ছুঁচের মত লেজ আর যার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ বুঝতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না! তোমাদের বাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে, এ প্রভেদ তখনই ধরা পড়বে। একটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সেটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি কখনো হয়? আর এক কথা। এই পাখীর বর কনের মধ্যে এমন ভাব যে একেবারে মাণিকজোড়! পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়! কাজেই আমি যখন শিকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাই বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়; আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য আমার হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট্ট লাটসাহেব ওরফে কালী বাবুকে নজর দিতে হবে। তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু করবেন। তখন আমার অবস্থা কি যে হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ করতে পারছ।

স্নাইপ আর স্নাইপ শিকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙ্গিনা হতে অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের করাত চালার মত আওয়াজ শুনেছ—আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন তার সে শব্দের বিরাম হয় নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শিকার করতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতার ভরা ডালপালা দিয়ে একটা আড়াল করে নে'। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুত নয়; তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল হাতীতে বাঘের যাওয়া আসার গলিপথ আবিষ্কার করে ফিরিবার আগেই

কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শিকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্য রকম; তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যমরাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানত যমের বাহন মহিষ। জীবন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছপা হত না বোধ হয়। যাই হোক ভূতায় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মত লক্ষ্যবেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল; তা না হলে বাহনটি মারা গেলে ভদ্রলোকের চলাফেরার মুস্কিল হত।

হরিপুরের চারিদিকেই বুনোশূয়ারের বসতি। পাবনার বুনোশূয়ার তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদর পুরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে যে সব সুঁড়ি পথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞান লাভের সুযোগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্বিঘ্নে তুমি বেশ শিকার করতে পারবে। আমরা যে শুনতে পাই শিকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হয়েছে; এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ ত নয়ই; মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিম্বা দুঃসাহসিকতা; চলতি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি!

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক। তাই সাহস আর বুদ্ধি দুইয়েরি বিশেষ দরকার! তা না হলে এ খেলার কোন আমোদই থাকত না!

সে খেলার দাম, নয় কাণাকড়ি,
হুসিয়ার জোয়ানের কাছে,
নাই যাতে ভয়, নাই লড়ালড়ি,
বিপদ সঙ্গীন ছোটেনা পাছে!

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তাহতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শিকার ক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিষ তোমার জানা থাকবে, অন্ততঃ থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শিকারী হতে না পার, তার জন্যে আমি দায়ী হব না। শুধু পশু পাখীর প্রাণ হানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শিকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজীতে যাকে Gentleman বলে তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ Gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শিকারী (Sportsman)। জীবনটা ত সহজ ব্যাপার নয়! বিশেষ করে আমাদের ভারত-বাসীদের জীবন; আশে পাশে চারিদিকেই কত বাধা বিপত্তি। শিকার করতে গিয়েও দেখবে, কত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতা বিরোধী কত হীন ব্যবহার,—এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা!

তোমার বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে, তোমার মত মহাজ্ঞরত কথা কেউ জানে না। তোমার বয়সের কেন, কোন বয়সের ছেলেই জানে কি না সন্দেহ। তাই তুমি জীবনে কি ভাবে

চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধা নেই। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই। সে হচ্ছে **স্পিরিট অফ স্পোর্টস** (Sports), অর্থাৎ ভাল খেলোয়ার হওয়া চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতা দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলোয়ার, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জর্ম্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভালো Sportsman'রাই সব চেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তার অনেক গুণই তারা মৃগয়া ক্ষেত্রে অর্জ্জন করেছিল।; এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দীপাঠ প্রথম অঙ্কে মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুট-বলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থি মজ্জা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ তারি সূচনা হয়। ইংরাজ বাচ্চার মধ্যে এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, তাই পরে তাকে জীবনের ঝড় ঝাপটায় তরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙ্গীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে। এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের ভীষণ পরীক্ষায়, বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব! বৃহত্তর জীবন সংগ্রামেও এই সুকৃতির ফলে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট্ট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে রাজার আর স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্ত্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে! এক দিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল, বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আর কর্ম্মে পরিণত হল না,—এখন সে স্বপ্ন আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশঃ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেছ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে; আমাকে দিয়ে যা হয় নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব করবে তোমারই দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমা-দের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হতে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি চাই সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুসিয়ার খেলোয়ার আর মজবুত পালোয়ান হও।

ধনুকে বন্দুকে তীরে তলওয়ারে
লাঠি, বড়সিতে আর
করগো শিকার, করগো শিকার
হও হুসিয়ার হও হুসিয়ার।
সাবাস জোয়ান, মুস্কিল আসান,
করে নেবে ফতে কেল্লা দুনিয়ার!

বেড়ে যাবে ছাতি, বাড়িবে ভরসা
নিদাঘ হেমন্ত, দুরন্ত বরষা,
কি করিতে পারে কার ?
ভালো খেলোয়াড় ভালো পালোয়ান
তারা যে মানুষ ভালো,
বাহির ভিতর সমান তাদের
কোথাও নাহিক কালো।
ভীরু যারা সব, নাকে কাঁদে শুধু
হাঁচি টিকটিকিতে ডরে,
তাদেরি পরাণে পাপের বসতি,
দেহে মনে ঘুণ ধরে !
পছন্দ সবার নয়তো সমান
ঝগড়া চলে না তায়,
তাস পাশা নিয়ে কারো কাটে দিন
কেহবা সমরে ধায় !
তবু বলি ভাই শিকার সবাই
করিলে করিতে বেশ,
জাল জুয়াচুরি চুরি বাটপাড়ী
ইহাতে নাহিক লেশ !
বন্দুকে বল্লমে তীরে তলোয়ারে
লাঠী সড়কিতে আর
করগো শিকার করগো শিকার
হও হুসিয়ার হও হুসিয়ার।
সাবাস জোয়ান, কিসের পরোয়া
করে নেবে ফতে কেল্লা দুনিয়ার !

এ চিঠি শেষ করবার আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সম্মুখে দিন রাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পড়ে শেষও করা যায় না ; রোজই নতুন কথা লিখছেন, এক ঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপসি হয়ে বসে, আপন খেয়াল মত চলেন। অনেক সময় ভুল করে, চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান। তাই যা সত্যি তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়। তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন

উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার শিকারের গল্প শুনবার জন্তে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন সে গল্প করতে, আমি আমার মনে যে গৌরব অনুভব করি, তা কারো কারো কাছে হয়ত ছেলেমানুষি বলে বোধ হতে পারে! তা হ'ক। সেই পুরাণ গল্পই আমি আজ আবার তোমাদের নূতন করে বলছি।

কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শিকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদ দেওয়া উচিত। তিনিই এ রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ রাজকীয় জাতির সংখ্যা তত অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্য প্রদেশ সকলে তাদের নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন শ্বাপদ জাতির বংশক্ষয়ের জন্তে শিকারীরাই বিশেষরূপে দায়ী। এ কথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সত্য। চতুষ্পদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের যেমন হরিণ মহিষের সংখ্যা আমাদের দেশে এতই হ্রাস হয়ে গিয়েছে যে সেটা একটা ভাবনারই বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনও নির্ব্বিকারে জীবহত্যা করে না। যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রাণ হারান। আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শিকার যাদের ব্যবসায় আর জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করে না; জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যানিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত করবার জন্তে অনেক বিধি বিধান প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক। তা না হলে আমরা যে সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না। বহু বৎসর পূর্ব্বে কটক জিলায়,—এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি,—এক একটা শিকার যাত্রায় প্রায় তিন শত অনুচর সহযাত্রী হত! এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে ধরণের বন্দুক ঘাড়ে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাম্বুতে ফিরতাম তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক জন ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত। যে হতভাগারা উত্তরাধিকার স্বত্বে কিম্বা পয়সার জোরে এমন সব দানব অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেনি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূতপ্রেতের মত অমানুষিক শব্দ করে, ঢিল পাটকেল বড় পাথরের চাঁওড় ছুঁড়ে গড়িয়ে শিকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু চেষ্টার ফল কিছুই হ'তনা। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকরছানা, সজারু যেই পাশ দিয়ে যাকনা কেন, অমি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোরে। মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনো লোক, যারা জঙ্গলের অন্ধি সন্ধি খুব ভাল করেই জানে, তারা যে সময়ে নির্ব্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্য জন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শিকারী আমার মৃগয়া ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্তে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও

(৮ পৃষ্ঠা)

দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারলে না। যেদিন আমি পৌঁছেছি সেই দিন সকালেই সে এ মৃগয়ারীতি বিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল। কথাছিল খোঁজ খবর করে ব্যাঘ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে শিকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামছা, রক্তের জুলি, আর তার থে তলান অর্দ্ধেক খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল! পরে আমরা জান্‌লাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষ খাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশধরেরা করেছে। খুব সম্ভবতঃ শিকারী একটি চিত্তলের, অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের, আশায় সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল। মতলব যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আন্‌বে। ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শিকার করে ফেল্লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী। মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিল না। কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শিকারীরা যেমন নির্ব্বিচারে বনরাজ্যে জীব হিংসা করে বেড়ায়, মনে হয় বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এর প্রাণ নিয়ে তারই প্রতিশোধ তুললেন।

নরমাংস আর মৃগমাংস লোভী বাঘেদের কথা বল্‌তে গেলে বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও এক জাতীয়। তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের কিছু উপর (রোলাণ্ড সাহেবের পরিমাণ রীতি অনুসারে)। শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ"! বঙ্গভূমির জল বাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়। তাই তারা দেখতে সহরের কাঙ্গাল কেরাণীদের মত নয়। মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজা রাজড়ার মত,—মেদমাংসবহুল। চাল চলনও বিশেষ গম্ভীর রকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শিকারের সন্ধানে শুধু মাঠে বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহ ক্ষিপ্রগতি-রাজপুত বীরের মত দীর্ঘকায়, বসামাংসবর্জ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে সুঠাম, সুন্দর। তারা চতুর সতর্ক, দ্রুতগতি; সহসা তাদের শিকার করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্ব্বেই,—যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামল তৃণে সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে,—তখন তাদের শিকার করে করে ব্যাঘ্র বীরেরাও শীঘ্রই "ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ" হয়ে ওঠে। তখন তাদের দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রঘুরাজ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশু লাভ সহজ ব্যাপার নয়; অনেক পরিশ্রমই করতে হয়, হরিণ শূকর ভারি চতুর, পারত পক্ষে ধরা দেয় না। দিন গুজরান করতে মেহন্নত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গজে তোলা আর হয়ে ওঠে না। কাজেই নতুন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজে নিতে হয়। এদের সম্বন্ধে যা বল্লাম চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্ররাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকার চর্চ্চা করতে আসে না; তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় দূরে যায়। এ ছাড়া আরও এক কারণ আছে। যে রাজ্য কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজার যুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থ সাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্র দেশই শ্রেয়ঃ। এ ছাড়া দেশ বিশেষে এই সব জন্তু বাস করতে একটু ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধ হয়, আমাদের

হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে তিন তিনটা চিতা তিন মাসের মধ্যে উপরি উপরি আমার গুলিতে মারা পড়েছিল!

এদের স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশী। এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। তা নইলে স্ত্রী জাতিকে খাট করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমণি! তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই। না হয় তোমার পতি দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না। সন্তান পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশী সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধি খরচ, অনেক ফন্দী আঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণ পোষণের ভার নিজেকে না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না; উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন সেই মতলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড় সড় হয়ে যখন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনই তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয় বেড়ালের মত বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মাতারা অনাহারে অনিদ্রায় রাতদিন প্রাণপণ করে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। কিছুতেই আর নাগাল পাইনে। তারপর সাবালক পুত্রহত্যা পাপের বমাল সাক্ষীতেই সে বাধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক এক দিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতে উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে সে দেখলে দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়সে বড়, আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ; অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল। করুণাময় পিতা আর তার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল! এ খবর রাত্র ভোরে আমার কাছে পৌঁছল। কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না। এই ক'দিন ধরে ব্যাঘ্র বীরের তল্লাশে আমাকে ভারি হয়রান হতে হয়েছিল, কিন্তু বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল। বাবা মশায়ের বুকে আর সেটুকু সইল না—পুরুষ ব্যাঘ্র ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়!

তোমরা মনে কোরনা বাঘ কিম্বা চিতা জলের ঘেঁষ নিতে চায় না সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্য; তবে দরকার হলে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ—যাঁদের সকলেরি সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত—আমায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে, বাঘ শিকারের সময় তাঁরা দেখেছেন এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন সে যেন ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল। তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে খর্ব্ব ঘাসে ঢাকা মাঠ; তার চারিদিকে হাতীর উপর শিকারী। এর মধ্যে কোন হিসেবে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হল না। ক্রমে আবিষ্কার হ'ল মাঠের এক ধারে একটি খাল; বাঘটি টুপ করে তারি জলে নেমে শুধু মাথাটি জলের উপর ভাসিয়ে

কারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে পিটতে পিটতে আসছিল — ১১ পৃষ্ঠ

রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে! সেই অবস্থাতে সে মহারাজা—র গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ কিম্বা চিতা যাই বল (এদের মধ্যে আমি ত কিছু প্রভেদ দেখিনে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে বন ঝোপে কোণঠাসা হয়ে আটকা পড়েছিল। পালাবার পথ তার একটি মাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো ধুতির মত কম চওড়া একটা খুব্বি পথ। আমি ওরি পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শিকারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে পিটতে পিটতে আসছিল। আমি একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন আমার অবস্থা, "পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং।" কিন্তু কৈ কারো দেখা নেই; আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল। কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এ কথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি। আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে অরণ্য সম্রাট শার্দ্দূল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে নদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে। হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল। অন্য শিকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি ব্যাঘ্র সন্তর্পণে জলে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে। শিকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে সবে থমকে দাঁড়িয়েছে।

এখনও দেখা যায় বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। নদীর কিনারা পর্য্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল; তারপর ধারে ধারে অনেক দূর সাবধানে হেঁটে গেছে। নিরাপদ পার ঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁতরে অন্য পারে যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় উঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে তা সে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন করে নিয়েছিল। এই সব নদীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা বিশ্বাস করা চলে না। তবুও হিতোপদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে আমি যার কথা বলছি তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে জেলের জালে আটকা পড়ে বিঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃতদেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই, মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শিকার পেয়ে তারা ভারি খুসী হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস, চখাচখি আর স্নাইপের মস্ত মেলা বসে যায়। কথায় বলে, "গাঁ দেখবি ত কলম, আর বিল দেখবি ত চলন!" এ বিল সেই বিখ্যাত চলন বিলের শাখা। এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চরে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময় (তখন আমরা ছেলেমানুষ) নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন, দই ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না। ফলারে বামুন পাত পেতে বসে গেছেন; কর্ত্তারা ঘরবার করছেন। এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গয়লারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে, এক পাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক

করে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ি মাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে! এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে। তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনাহতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দ্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুজে প্রতীক্ষা করে থাকৃতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই। বিলগুলি মাঠ হয়ে তাতে চাষবাস চলছে। মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে বাঘেরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকেন —তবে ভিন্ন কারণে (মানুষে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়)। আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নামলে আর উঠতে চাইনে, তেম্‌নি আর কি।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খৃঃ।

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল। পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায়। চিতাদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকাগড়নের ; বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান ?—বাচ্ছাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারে। পায়ের একটা দাগ হতে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি দেখলে সেটা সহজে বুঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুয়েরি সমান। তবে খোকা বাঘের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকির লম্বা। এটা নজর করে দেখা ভাল। কোনও জীবেরই শিশু হত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হতে দেওয়া উচিত। এতে যদি তোমার হাতের শিকার ফস্কে অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে, তবুও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বাঘ ও চিতা কি করে গরু মোষ মারে এ খবরটা জান্‌তে সবারই কৌতূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি ; তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপস্থিত হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিম্বা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়। আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝু'কে পড়ে তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্তুটির উপর ব্যাঘ্র ঝম্পনে এসে সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে করে কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে কিম্বা তলায় রাখে। শকুন, হাড়গিলে কিম্বা মাংসাসী জন্তুদের মুখ হতে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্নি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্য পারে রাখতে দেখেছিলাম। এম্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে রাখলে যে সেধারে যে মাটীর ঢিবি ছিল তাহতে এক আঁজল ধুলোও খসে পড়লনা! পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড। আর অতবড় মোষটিকে, বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল! এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণতঃ এমন অজ্ঞতা যে, অনেকেই গম্ভীর ভাবে বলেন, "কাপড়া চাই মেম্ সাহেব", বলে যে ফেরিওয়ালারা সহরের অলিগলিতে ফেরে, ব্যাঘ্রবীরও তাদেরি মত তার শিকারের বোঝা পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়। আর একটা হাস্যকর ধারণা যে বাঘ গিয়ে মোষ কিম্বা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে ; দুটোতে খানিকটে খুব টানা হিঁচড়া চলে ; তার পর সুযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেম্নি মুখ থুবড়ে পড়ে, আর অম্নি ইনি

গিয়ে ঘাড়ের উপর চেপে বসেন! এই হচ্ছে মামুলি বিশ্বাস। আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছু বল তাহলে সেটা তোমারই অজ্ঞতা বলে প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না বলে এগিয়ে চলাটা ঠিক হবে না। একবার সুন্দর বনে বাঘে একজন নাপিতকে দিনে দুপুরে আক্রমণ করেছিল। ধূর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়! সে কর্লে কি জান?—তার পুঁটুলি হতে নরুণটি না বার করে বাঘের গলায় বসিয়ে দিলে! আর যাবে কোথা? বাঘ আর পালাবার পথ পায় না! কিন্তু পালাবার যো কি? চতুর নরসুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধরে আটক করেছে! ফলে কি দাঁড়ায় জান? থলের মুখ ফাঁক পেলে ইঁদুর যেমন পালায়, বাঘটি তেম্নি করে দে চম্পট! কিন্তু আলাঙ্গুল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি বিজয়ী নাপিতভায়ার হাতেই রয়েই গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তেম্নি নাপিত সবেমাত্র একটি ভূ-ভারতে জন্মে ছিল! মরণকালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সঙ্গে করেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলেছিলেন তিনি পরে জার্ম্মানদেশে অস্ত্র চিকিৎসা করাতে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটী অমর হয়েই আছে।

চিতার শিকারপদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন। সে ঘাড়ে গিয়ে পড়ে বা গলায় কামড় দিয়ে ধরে থাকে। জন্তুটী মরে পড়ে গেলে তবে তাকে ছাড়ে! লোকে বলে রক্ত শুষে খাবার জন্যে সে এম্নি করে; কিন্তু এটাকে সাক্ষ্যস্বরূপে মেনে নেওয়া চলে না, কেননা এ সম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূর জানি, তাতে বল্তে পারি চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্ত্বিক। বাঘের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিম্বা পর্য্যুষিত আহার করে না। আর তা' ছাড়া চিতা পরের শিকার করা জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাচ-বিচার নেই—যা পায় তাই খায়;—তবে ক্ষুধার তাড়নায়, দুর্বোধ স্বভাবের জন্যে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার করা একটা মোষ অধিকার করে বসেছিল। তারপর যার সম্পত্তি সে আস্‌বামাত্র "অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ", এই নীতি বাক্য শিরোধার্য্য করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শিকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত। কিন্তু যখন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল তখন দেখা গেল তার শরীরখানি একেবারে অস্থিচর্ম্মসার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে তার টাকরায় অনেকগুলি সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হয়ে গিয়েছে। মুখের চারিদিকে মৌচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি। এ অবস্থায় চুরি করে খাওয়াত দূরের কথা, মুখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই বহুদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শিকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হতে পারে, সে কথা অনেক শিকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নানা শিকারীর নানামত। তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় বলে, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত। কেননা দেরি হলে দেখা যায় তার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আমি একবার

দশফুট লম্বা একটা বাঘ শিকার করি। জঙ্গল হতে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে আসা, এই সময় টুকুর মধ্যে পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধুদের ভারি আমোদ বোধ হয়েছিল। বলে রাখা ভাল সে দিন তাঁদের ভাগ্যে কোন শিকারই জোটেনি! মৃত্যুর পর সব জন্তুর শরীরই কঠিন হয়ে পড়ে। তবে বাঘেদের দেহে এই কাঠিন্য যত শীঘ্র দেখা দেয় অন্য পশুর শরীরে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি মাতা এ জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা' তাদের দেহে এ টে বসে না, আল্‌গা থাকে। এর কারণ এদের দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে গিয়ে না পৌঁছায়—তা হলে প্রাণহানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্ব্বদাই হচ্ছে। সেটা শক্ত চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশী সাংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্যেই প্রকৃতি আচ্ছাদনটি ঢিলে দিয়েছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়। চিতাবাঘের এর অর্দ্ধেক বাড়ে। একই দৈর্ঘ্য এবং আয়তনের বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশী হতে প্রায় দেখা যায় না। একটা বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত হতেও পারে। এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল। একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি। পালাবার সময় যেখানটি শিকারীরা ঘেরাও করেছিল, সে সেইদিকে ছুটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে পড়ল। এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল। তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সে সেইখান-টিতে মরে পড়ে আছে;—ঘাড়টি মটকান, নখের কিম্বা দাঁতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিল না। পলায়নতৎপর ব্যাঘ্ররাজ হয়ত একবার সন্তর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন!—প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সম্ভাষণের মত! তাতেই তার এই দশা; একেবারে "পপাত চ মমার চ"। এ হতেই জন্তুটির ওজন যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য ও নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাঘের সমান না হলেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারি ভয় করে। বনচর জন্তুদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ঘৃণ্য স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয় আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে সুদূরে পলায়ন করে। ব্যাঘ্ররাজও এই "যেন গতা স পন্থা'র" অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে। শিকারই যদি সব পালাল তবে শিকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল? ভালুক আর পাহাড়ে চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে গুহাগহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শিকার এদের উপদ্রবে একেবারে মাটী হয়ে গিয়েছিল। বাঘ, সাম্বর, অন্য মৃগপাল সব কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল! আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম তার দু'দিন পরে বাঘ ভল্লুক হরিণ নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারি চালাক। এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক এক জন গিয়ে এক একটা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে, আর অন্যরা শিকার তাড়িয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে। কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে শীগগির দৌড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের পালের একআধটিকে মেরে ফেললেও আর

গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না; কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছক্তি রহিত কর্ত্তে পারা যায় তাহলে কাজ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে একজন স্কচ (Scotch) শিকারী তাদের যে বর্ণনা করেছেন সেটা সর্ব্বসাধারণ্যে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন জন্তুদের মধ্যে এদের মত "খেঁকী, বেয়াদব, ঘৃণ্য জানোয়ার আর দুটী নেই"—(**The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts**)। এমন সকল শব্দের উপযোগিতা নিশ্চয়ই আছে। অপব্যবহার হয় নাই। এম্নি একটী জঘন্য 'শব্দ' (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানবপ্রবর "আদমের" মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম জন্ম লাভ করেছিল। আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইভা (Eve)'র ব্যবহারে হয়নি, একথা কে সাহস করে বল্‌তে পারে? আইন যাঁদের পেশা তাঁরা বলবেন এম্নি আর একটী বহু প্রাচীন কথা তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে **alibi**। এটাও নিশ্চয়ই আদিম পাপের মতই পুরাতন। "আদম" জিহোবার বিচারকালে এই **alibi**—গরহাজিরের অছিলা—করেছিলেন, কিন্তু বিফলে। আমাদের জজ সাহেবেরাও যদি একথাটা জান্‌তেন তাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাক্‌ত!

একবার একটা চিতা হঠাৎ কোন দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'ল তা আর কারো বোধগম্য হলোনা বলে (এর কথা পরে আরো শুন্‌তে পাবে) আমরা সবাই—শিকারী, লাঠীয়াল, বরকন্দাজ—তার অনুসন্ধানে বা'র হ'লাম। জায়গাটার পাশে এক টুক্‌রা জঙ্গল ছিল। সেটা কারো নজরে পড়েনি; কেন না সেখানে গাছপালা কি ঘন ঘাস এমন কিছুই ছিল না যার আড়ালে আবডালে কোন জন্তু এমন কি একটা বেড়ালও লুকিয়ে থাকা সম্ভব! আমরা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিন বার এর চারিদিক উটক-পাটক করে দেখে যখন কোনই কিনারা করতে পারলাম না তখন এরি পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ করলাম। লাঠীয়ালেরা সবে মাত্র দুপা এগিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয় আমার তাদের সব কথা বলা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়িতেছে। তারপর দেখি কি না, চিতাটা বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিক্‌টিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যে আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল! আচমকা শব্দ শুনে সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল, আর মনে করলে এটা কেমন করে ফসকে আওয়াজ হয়েছে। কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হয়ে মরতে দেখলে তখন আর তাদের বিস্ময়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার খোঁজে চারিদিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিলাম তখন কেমন করে নিঃশব্দে লুকিয়েছিল। আর অতবার আনাগোনা করা সত্ত্বেও আমাদের চোখে পড়েনি! এটা ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়।

বাঘশিকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এখানে বলা ভাল। তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। এই সবে গেল বৎসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর **K. G. B**'র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটা বাঘিনী আমার নির্ঘাত গুলির ঘায়ে মরে পড়েছে। আমরা সবাই মিলে চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-কাটা সুন্দর চামড়া খানির আর নধর দেহের প্রশংসাবাদ করছি। একজন লাঠীয়াল কাছাকাছি আর বেশীর ভাগ পাহাড়ের মাথার উপর রয়েছে। আমাদের কাছে পৌঁছিতে হলে তাদের অনেকখানি পথ নেমে আস্‌তে হবে। বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠীয়ালেরা চীৎকার করে তাদের বলছে। তারা মহানন্দে পাহাড় হতে দৌড়ে নেমে আস্‌ছে। কাছাকাছি যারা

ছিল তারাও ভিড় করে ঘিরে রয়েছে। আমি আমার বন্দুকটী গেলাপবন্দী করেছি। এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লুক-দম্পতির ছপ্ ছপ্ শব্দ কাণে এসে পৌছিল! K. G. B. বন্দুক হাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন! স্বাগত সম্ভাষণের মাহাত্ম্যে একটি ত তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হন! ইহ জীবনের মত তার আর বাক্য নিঃসরণ হয়নি। অন্যটী চারিদিকে লাঠীয়াল শিকারীদের গোলযোগ, বাঘ ভাল্লুক মারা পড়বার বিভ্রাটের সুযোগে পলায়ন দিলে। সুখের বিষয় কারো কোন হানি করে যায়নি। আমি গেলাপ হতে বন্দুকটী বার করে নেবার দু'এক মিনিটের মধ্যেই এতখানি কাণ্ড হয়ে গেল!

আর বেশী দূর না এগিয়ে, এলো মেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে, এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শিকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হতেই বল্‌ব। এ ব্যাপারে যখন সম্ভব, পায়ে হেঁটে শিকার করাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর করে বল্‌তে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছিনে। এ বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে Hill Hunting'কে, অর্থাৎ বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে শিকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলৌকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায় সেটা বিরক্তিজনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়ত ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমনভাবে শিকার করা সম্ভব নয়। পাহাড়ে জায়গায় এ সুযোগ খোজা দরকার, আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্তুবিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায় এ ভাবে হাত করতে পারাই শিকারীর মৃগয়াকৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নিদর্শন, ব্যাঘ্ররাজের ডোরাকটা আঙরাখা, ভালুকের লোমশ কোমল কম্বলখানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্টপ্রকাণ্ড শৃঙ্গযুগল, মহিষাসুরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শৃঙ্গফলক, বরাহ অবতারের খড়্গের মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ করে গৃহের শোভা আর আপনার বীর্য্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, ধৈর্য্য চাই। যে মানুষ এগুলি অর্জ্জন করতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেকখানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই, দান করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে কিন্তু শিকারী সেখানে কমই যায়। কেন না সেখানে সহজ গতিবিধি নাই, সৌখীন চালচলন চলে না। শিকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেঁথে মাছ ধরার মত চুপ করে বসে থাক্‌তে হয়। বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁটা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়। তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্যে এইটা সবচেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তু বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তা'হলে বাঘটিকে তার মৃতশিকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত শিকারের কাছে পৌছিবার জন্যে শিকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কাণে কাণে কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না; আর শিকারী ও তাঁর অনুচরদের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চীল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে আছে। তোমায় আস্‌তে দেখে শিয়ালগুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যত্র সরে পড়ছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না। এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটী যে

কোথায় আস্তানা নিয়েছে তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌঁছিতে হলে গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে এগোন ভাল। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিম্বা নদীর শুক্‌ন খাল কিম্বা বন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারি একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাঘ্রবীরের জানা আছে জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাক্‌তে পারলে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শিকারীরা দেখে শুনে এই জ্ঞান লাভ করেছে, আর শিকার করবার সময় ময়ূরের এই দুর্ব্বলতা স্বার্থসিদ্ধির উপায় করে থাকে। আমি এক বার শিকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম। এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল। দেখলাম একজন শিকারী বাঘের মত ডোরাকাটা একটা হল্‌দেটে রংঙের পর্দ্দা নিজের সম্মুখে আড়াল করে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবতঃ ভারি ভীরু আর লাজুক। কিন্তু বাঘের মত এই ডোরাটানা পর্দ্দা দেখে তারা ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। পর্দ্দা যতই এগোয় ময়ূরগুলি ততই ফূর্ত্তি করে, বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে বেড়ায়। গ্রাম্য শিকারীটি ২৫ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে হতাহত করলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দ্দার আগে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইত্যবসরে শিকারী আরো একটাকে গুলি করে সামনের পর্দ্দা ফেলে দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করলে। এই পর্দ্দাকে তারা বলে "বাঘিনী"-মোহিনীশক্তির আধিক্যবশতঃ বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হয়েছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা শুনেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করিনি। অমন সুন্দর পাখী মারা ভারি নিষ্ঠুরতা। অমন নিষ্ঠুরতা যে আমার চোখের সম্মুখে ঘটতে দিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ শোনাকথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম তার বড়াই নিতান্তই গালগল্প কিন্তু দেখলাম অন্য রকম। সে বল্লে ময়ূর শিকার করা যে শিকারীদের ব্যবসা তাদেরই কাছে এই "বাঘিনী"র চাতুরীটা সে শিখে নিয়েছে। এই শিকারীরা তীর-ধনুকে ময়ূর শিকার করে থাকে। কোন কোন বন্যপ্রদেশে যেখানে চারিদিক গুল্ম কিম্বা ঘনতৃণ সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকা স্তূপ আর জলহীন পাণার প্রাদুর্ভাব সেখানে শিকারী হাতী পাঠিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে তার হত-শিকারের কাছে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে যে হাতী এ বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে কিন্তু এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

সব সময় হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন সওয়ারীর মত বসতে হয়। পা রাখবার জন্যে দুটি জায়গা থাকে। এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়; বিশেষতঃ পথে এগোবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বিজেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তাহলে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটা বিপুলবপু অনাহূত আগন্তুককে অকস্মাৎ আস্‌তে দেখে বাঘ ও চিতা এম্নি স্তম্ভিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারবার সময় কোন বাধা দেয় না। সাম্বর হরিণও ঘন ঘাসবনের মধ্যে ঠিক এইরূপই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু বিচিত্রক হরিণের বসতি এবং স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হয়ে ওঠে, তাহাদেরও আমি অনেকবার অনেকগুলিকে এই উপায়ে শিকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপর বসে শিকার করতে গেলে একটা বিষয়ে তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না। তা সে যতই ভারী হোক না কেন। হঠাৎ পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটবে বলা কঠিন। বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না এ কথা কে বলতে পারে? শিকারের খোঁজে বেরুতে হলে আগে হতে সাবধান হওয়াই ভাল। জান ত কথায় বলে "সাবধানে বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল। তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে বেড়ালে তার সঙ্গে এম্নি বন্ধুত্ব জন্মায় যে বিপদের মুখে সে নিশ্চয়ই সহায় হয়ে দাঁড়ায়, আর অনায়াসে তার সাহায্যে শত্রু বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলে তারাও জানে ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে।

Ph.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিক মত হচ্ছে কি না দেখতে গিয়েছিলেন। আমি বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দুকটা নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তার দুধারে খাড়াই পাড়, ঝোপঝাড়ে একেবারে ঢাকা। বেশী দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কাণের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে গজেন্দ্রগমনে চলে গেল! Ph.—হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর পায়ের শব্দ কিম্বা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি সুযোগ হারালে বল দেখি!

Ph.—কে তোমাদের মনে আছে ত? Bisley আর অন্যত্র কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল! শেষ কালে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হতে বসন্তরোগী ছোট্ট একটী মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেই রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিতলের খোঁজে বহু দূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ূরের কর্কশ কেকাধ্বনি কিম্বা কপোতের মৃদু গান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্যসুলভ দু'একটা অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ কানে আসছিল। কোথা কিম্বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই যেন নিস্তব্ধতাকে আরো গভীরতর ও অস্বস্তিকর করে তোলে। কখনো কোন মৃত্তিকা স্তূপ ডিঙিয়ে, শুক্‌নো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলই এগিয়ে চলেছি। একবার মনেও হয়নি কোন কিছু আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে পড়বে। কিন্তু তবু চোখ যদি ও কিছু দেখতে কিম্বা কাণ কিছু শুনতে পায়নি হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম কি একটা যেন আসছে। তার পর চোখ তুলেই দেখলাম প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী। কুলোর মত কাণ দুটো খাড়া করে শুঁড় গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বিচার বিবেচনার সময় আর তখন ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। যদি আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাইনি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বত-প্রমাণ একটী হস্তিনী শুঁড় তুলে হুঙ্কার করতে করতে দ্রুত অন্তর্ধান হল! গজেন্দ্রগমনে নয়! যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় না নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক না ভাবা আর না বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro Paradox ছিল। আর তোমরা ত জান হাতী মস্ত বড় জানোয়ার হ'লেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর

স্থানে সত্বর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদ যুগলের সম্মিলিত চেষ্টাতেও যে প্রাণ রক্ষা হতনা সেটা সুনিশ্চিত!

হাওদা-শিকার।

"হাতী পর হাওদা", আবার তার উপর নিজে রাজার মত বসে শিকার করা ত খুব আরাম! হিমালয়ের তরাইয়ে, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শিকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শিকার, করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র! এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতী শিকার সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল করে ফেলে। প্রতিপদেই গতিরোধ হয়। আর হাতীর পায়ের চাপে যে সব ঘাস ভেঙে পড়ে সে এম্নি মজবুত যে ভাঙ্গবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে যেদিন আমি প্রথম শিকার সন্ধানে গিয়েছিলাম সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এ যেন বিচালীর গাদায় হারাণ সূচ খুঁজতে যাওয়া! তবে মস্ত এই প্রভেদ যে এ ক্ষেত্রে যে খুঁজতে যায় তাকে নিরাশ হতে হয় না। যার আশায় "ঢুঁড়ত ফিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতীর উপর দোল খেতে খেতে তাক ঠিক রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে। আর তা ছাড়া ঢেউএর মত দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াচ্ছে, ভাব করে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শিকার ব্যয়সাধ্য। খুব কম লোকেরই এ রকম হাতী রাখবার সামর্থ্য হয়; আর যে দুচার জন রাখেন তাঁরাও এ সব হাতীকে রীতিমত শিক্ষা দিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে গুটি কত রীতিমত শিক্ষিত হাতী নিতান্তই দরকার। আর এ রকম একটী হাতী পাওয়া সহজ নয়। আর যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার দাম দিতে সোণার খনি নিঃশেষ করে ফেলতে হয়! তাই বা ক'জনে পারে? হাওদা-শিকারে কৃতকার্য্য হতে হলে এই রকম হাতী অন্ততঃ ২৪।২৫টি নইলে চলে না। কাজেই বুঝেছ, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ যার নাই তার ভাগ্যে এ শিকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শিকার ব্যাপারে বেশী উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শিকার করা তাঁরা গৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বল্লেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহারে বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ দেওয়া কড়া কামিজ ও 'কলার' তাঁরা মুনি ঋষির কৃচ্ছ্রসাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্য অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয় এক সময় কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল এখন সে সকল তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক করে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন! নিঃশব্দ-সঞ্চার মখমল মোড়া বাষ্পযান ব্যতীত চলাফেরা করতে তাদের মন ওঠে না! এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ। দৈহিক মাপটি তাঁদের ইংরাজ দার্জ্জির কাছে পাওয়া সহজ। এদের তরঙ্গায়িত বরবপুগুলি কোট প্যাণ্টে সামিল করে রাখা তাদেরই কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কি ভাবে এ সৌন্দর্য্য ফেটে পড়বে তার জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার দরবারে

একজন রাজকর্ম্মচারী কোনও জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"রাজা, একটি সিগারেট খাবে কি?" আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন,—"আমি শুধু হাভানা ব্যবহার করে থাকি"! হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দামী চুরুট। আজকালকার দিনে ম্যানিলা (manilla) আর মিউরিয়ার (muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও সদ্গুণের বিশিষ্ট পরিচয়! আর বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই, কুলচি জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সে ত ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে সমধিক গৌরবের বিষয়! বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায় তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ সর্ব্বদা কেবলমাত্র বাহাড়ম্বর ও অস্বাস্থ্যকর কপট আবরণের মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীনস্বভাব হয়ে পড়ছেন। মাঝে হতে রাজোচিত মৃগয়া কৌশলের ও চর্চ্চার সমাদর চলে যাচ্ছে।

হাওদার উপরে শিকার করা কোন কোন শিকারীর অভ্যাস আছে। তাঁরা অনেকগুলি করে গুলি-ভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমার মনে আছে একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাসবশতঃ মারা যান। হাতী যখন উপরের দিকে উঠছিল বন্দুক গড়িয়ে পড়ায় গুলি বাহির হয়ে যায়। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস করলে একটা বন্দুক রেখে আর একটা তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্ব্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায় নতুন অজানা বন্দুকের কাছে তা হবার যো নেই। আর একটা কাজ কখনো কোর না। সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে জন্তুটিকে যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখতে পাও ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। সম্মুখে ঘাস নড়ে উঠলেও জন্তুটি হয় ত তাহতে অনেক দূরে কিম্বা পিছনে পড়ে থাকে।

হাওদা-শিকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে।—তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্লিপ্ খেলে যার যেমন নাম উঠবে সেই ভাবে সাজান, কিম্বা শিকারের দলপতি - আর সকলে যার নিমন্ত্রিত অতিথি—তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন সেই মত সাজান। এই সারি বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শিকারের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। পতাকার সঙ্কেতে এগোতে পিছুতে, সারিটা প্রশস্ত কিম্বা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। এর চেয়ে কিন্তু হাওদায় করে দু' একজন শিকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শিকার জড় করিয়ে নিলে বেশী সুবিধা হয়। কোথায় কি ভাবে এ সব হাতী সারি বেঁধে দাঁড়াবে সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে যাতে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায় কিম্বা এই সব হাতীর উপর এসে না পড়ে, সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দুইই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে বাঘ গুড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যে, চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়; কেননা বাঘ যেমি এই হাওদাধারী হাতীটিকে দেখে আর অমি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে সে বড় চমৎকার দৃশ্য! দেবতারা দেখলেও খুসী হয়ে যান। এ স্থলে শুধু হাতীটি নির্ব্বিকার হ'লে চলে না—শিকারীর গুলিটিও

"আমাদের সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, গারো পাহাড়ের চোরা বালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল।"—(২১ পৃষ্ঠা)

আবকল সোজা চলা চাই। তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে ত শিকার মরে না। আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধা করা চলে না। গুলি ছুঁড়তেই হয়; তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হোক না কেন! গুলি ফস্‌কে গেলেও এ সময় কাজ হয়; কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়। কারো ক্ষতি করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথাও একটা খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে সে খবর জানতে দু একদিন চলে যায়। যখন দেখা যায় মস্ত মস্ত শকুন চক্র করে ঘুরে ঘুরে উড়ছে অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না কিম্বা ভূঁয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনই বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মাঠে গরু মোষ বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি। এই উপায়ে একবার চমৎকার একটী বাঘিনীকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা-শিকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া। হাতীর মত সাহসী সতর্ক জন্তুও কাদায় পা বসে যাচ্ছে দেখ্‌লে ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কাল্‌কের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আসছে। আমাদের হাতীর সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পাচশটি হবে, গারো পাহাড়ের চোরা বালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হারণ শিকারে বেরিয়েছিলাম। পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর। খুব সম্ভব পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচ এসে পড়েছিল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটা কয়েক হাত গভীর চোরা বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা তখনই শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম। অনতিদূরে হাত চল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটী হাতী প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে লাগল। সবাই ভয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছিল। যাদের পিঠে হাওদা ছিল সব চেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরই। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটা হস্তিনী সব প্রথম নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছল। এই বুদ্ধিমতী বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ে উপড়ে নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে পা রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা—একটা হাতী হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল,—বৃথায়! আস্তে আস্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! মাহুত শুধু প্রাণ হাতে করে সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শিকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শিকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীত মনে সাহায্য করা। যদিই বা শিকার নিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শিকারকর্ত্তা এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন সেইটিই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল তবু কলহ করে মৃগয়া শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনও উচিত নয়। একটুও মন ভারী না করে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটা গ্রহণ কোরো আর মনে কোরো, সেইটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। স্বার্থপর, অসন্তুষ্টচিত্ত লোকেরই "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে।" নির্ব্বোধ কিম্বা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারই চাক্ষুষ এই রকম একটা ব্যাপার

ঘটেছিল। খবর এ'ল একটি প্রকাণ্ড বাঘ বাথানের সব চেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে। তার পর সেটীকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শিকার শুদ্ধ এক শিমুলতলায় উঠেছে। আমরা সে দিন একটী আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শিকারকর্ত্তা সেটীকে গুলি করেছিলেন, মারা পড়েনি। সেই জন্যে সে দিন আমরা নূতন আগন্তুকের খোঁজে আর গেলাম না। যদিও সহজেই এ কাজটা সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শিকারকর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ সংস্কার বশতঃই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের জন্যে অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার—শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম ঔষধ, নিদান কালের বিষবড়ি, প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফল লাভ করে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে রহিলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লেখবার মত প্রসঙ্গ নয়। বিশেষতঃ তাহাতে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গোহত্যাকারীকে পাহাড়, মাঠে, খানাখন্দ, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটী হাতী কম পড়ে গেল। তাদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল। আমাদের শিকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না করে শিকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল। তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরুবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে তারই তীরে ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চার শ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ। দুকোণায় জঙ্গলটি ক্রমে ফাঁক হয়ে এসেছে; গাছপালা বড় একটা ছিল না। বাঘ যে পথে আসছিল সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল। তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নূতন করে বেঁধে হাতীর মুখ ঘুরিয়ে বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম। ঠিক ডাইনের দিকে খানিকটা খোলা ময়দান আর গোচারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিন হাওদায় তিনজন শিকারী ছিলেন। উভয় দিক হতেই তাদের অধিকৃত স্থানগুলিকে উত্তম উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হলে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০ গজ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল। সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্কফলার মত,—এদিকে ওদিকে খোঁচা খোঁচা শূয়োর কুঁচির মত খাড়া খাড়া! দুএকটি গাছ সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা আরও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধরে হাতীর সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল চারিদিকে উত্তেজনার আভাস ততই দৃষ্টি ও শ্রুতি-গোচর হল। হাতীর গুঙ্কার শুণ্ড আস্ফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বুঝা গেল বাঘ নির্দ্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতীর সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতীগুলি যেমন দৃঢ়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সহজে সেখান হতে পলা-

য়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই আমার সমস্ত শরীর যেন সজীব হয়ে উঠ্‌ল। আমি রুদ্ধনিশ্বাস একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। দু'এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দুলরাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। তখন সে দূরে, অনেক দূরে। সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরও কাছে এগিয়ে আসবে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি এবং মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল—০৪৬৫নং গুলি ছুটে গেল! ব্যাঘ্ররাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হ'লেন? না অদৃশ্য হননি! বিরল তৃণরাজির মধ্য হ'তে দেখতে পেলাম তিনি ধরাশয্যা গ্রহণ করেছেন! বিশাল শরীর নিস্পন্দ; জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই! মাহুতকে হুকুম দিলাম, "বাড়াও"। ডানচোখের উপর একটি সামান্য ক্ষতচিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক-মিশ্রিত রক্তধারা বয়ে আসছে; শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়!

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারই পরিচিত কোন স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হ'তে একটী ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে ভারি ভয় পেয়ে গেল। পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠভাঙ্গা, ফল কুড়িয়ে আনা এক রকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। নিজে অলক্ষ্য থেকে শিকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে আসে সেই খানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন, শুনলাম। তিনি বাঘিনী হলেও শিকারী কম ছিলেন না,—গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজাড় করছিলেন। স্থানীয় শিকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরেছিল। কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্তুস (cartridge) ছিল তা ফেটে গুলি বাহির হয় নি। বাঘিনী সেই যে চম্‌কে পলায়ন দিলে আমরণ সে প্রলোভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি। কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। যদিও এ কথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না জানি। কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসাজীবীর জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান তার কাজ না বাজিয়ে তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ করবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেই শিকারের সুযোগ ক'রে নি। তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গাঁটের কড়িও মন্দ খরচ হয় না।—আর একথা আগে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় করে মফঃস্বলে মামলা করতে গিয়ে সপ্তাহান্তে যে দুদিন কাছারী বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের যোগাড় করেছি। মনিব্যাগ খালি হয়েছে বটে কিন্তু শিকারের ঝোলা ময় বা ভরেছি। একবার একজন জজ মজা করে আমায় বলেছিলেন মফঃস্বলে আমার দুই শিকার জোটে—এক মক্কেল, দ্বিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল পুরাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করি তখন আমার দু'একজন হিতৈষী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আইনের চেয়ে শিকারেই আমার বুদ্ধিটা খেলে ভাল। যে সব মানুষের শিকার-বাতিক আছে ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল। সেখানকার মত চাঁদ দেখে

এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না। আর তা ছাড়া সং খৃষ্টানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে দুদিন কর্ত্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে থাকেন! সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরও দিন কত বেশী ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। তবে এই সব অল্পদিনের ছুটির মুস্কিল এই যে আপনাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না। মনের মধ্যে কাজের ফাঁসটা টানাই থাকে, বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শিকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে আমার সঙ্গ ধরলেন। রাত দুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছিলাম। যাঁদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরা পোঁট্‌লা পুঁটুলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছিবার পর একজন হাস্‌তে হাস্‌তে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনে আমার বন্ধুর যে হাসির ফোয়ারা ছুট্‌ল তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়ল! আমি তাকে বোঝালাম—

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.

অর্থাৎ—প্রস্তর-প্রাচীর হ'লেই কারাগার হয় না,
লৌহ দণ্ড স্থিতিমাত্রে হয় না পিঞ্জর!

কারাগার হলেও নির্দ্দোষী আমাদের কাছে সেটি শান্ত আশ্রমপদ বলেই মনে হয়েছিল।

ভোর হ'তে না হতে আমরা মহাসমারোহে যাত্রা করলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রথ। কিছু ক্ষণ পরে বৃটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এর কিম্বা এরই মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি তবে যেন শিকারের সুবন্দোবস্তের জন্যে এম্নি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তীপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়া পৌঁছিলাম। এর আগেই শিকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল সে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান স্বর বারংবার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাদ্য!

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি খবর। আমার বন্ধু যেটা সুবিধার কথা মনে করেন নি। আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন। তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটী স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাইবার উদ্যোগ করছিল, পারে নি। সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাঘ্রী একটী নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাট্‌কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে

ভোর না হতে মরা মহা সমারোহে যাত্রা করলাম

২৪ পৃষ্ঠা

সে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পায়ে হ'তে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হ'তেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল।—কোথাও গড়িয়ে-পড়া এক খণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ। এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থিরনিশ্চয় না হয়ে পা বাড়ান আমরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়টি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট; তার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি এক জন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো দুটি পাথরের ঢিবি, আর গুটি কত গাছও ছিল। ঘাটের পথ ছেড়ে দু'চারিটি সরু গলি এরি মাঝ দিয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটি কত গাছ ছিল। গাছের ডাল-গুলি এমিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি অথচ চারি দিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শিকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ চিত্তে যায়, তোমার দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। মানুষের গন্ধ হয়ত বা পায়, কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে গন্ধও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ, কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে শিকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারি দিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডান পাশে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. Bকে একখানি ছোট্ট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেইখানকার এক জন গোটিয়া তার সঙ্গে ছিল। চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সংকীর্ণ হোক না সে তারই মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার সুবিধা করে নিত; কোন রকমে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাক্‌ও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর বনের মধ্য হতে যে সব শিকারীরা বাঘ তাড়া করে আনছিল তাদের সোরগোল শোনা গেল। আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আমাদের মধ্যে জন-কয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম তুলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্রী ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে। নিমেষের জন্যে সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তা। স্কন্দদেশ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি

একটু শব্দ হয়েছিল তাতেই সে ঘাড় ফিরালে। গুলি তার কাণের মধ্য দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল। তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় করলে না, তখন বন্দুকের যে নল খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শিকারীরা কয় জন পাহাড়ের মাথা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে, আর বাকী কয় জন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকা পতন না হয় ততক্ষণ এ সাবধানতা বিশেষ আবশ্যক। জয়গর্ব্বে-উৎফুল্ল আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। সঙ্কেতসূচক বাঁশিটি বাজিয়ে দিলাম। তখনই চারি দিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সঙ্কেতে মহানন্দ প্রকাশ করলে ও নিকটে এল। K. G. B. আর গৌটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্ররাজ-পত্নীর রাজযোগ্য অঙ্গাবরণ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাহাড়ের মাথার উপর যে সব শিকারীরা ছিল তাদেরই মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি। সেই সঙ্কট স্থান হতে নেমে আসবার জন্যে তারা ব্যাকুল, অথচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২রা সেপ্টেম্বরের ভল্লুক-বিভ্রাট ঘটেছিল। সে কথা তো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্য্যঙ্কে, আর ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয্যা রচনা করে দিয়ে, বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করলে। আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছ দেশে লম্বমান হয়ে তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে। মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চলল। বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি। সংহাররূপিণী শার্দ্দূল-বধূর মৃত্যুতে আনন্দ আর ধরে না। কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী। তার চামড়া খানি বড়ই সুন্দর। আমার এ বারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে নরখাদক ব্যাঘ্রের তপ্ত শোণিতের আবীর কুঙ্কুমে সুসম্পন্ন হল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভ সংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণকারীকে ও আর আর সমানুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সে গুলির উত্তরও নিয়ে এল। তবে বাড়ী আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণকারীর কাছ হতে যে আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কারও কাছে পাই নি।

শিকার করে এমন সুন্দর বাবছাল যদি লাভ হয় তবে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ যত্ন করতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্ম্মশোধনকারী Messrs Rowland Ward'এর নিকট এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জর্ম্মানদের অনুগ্রহে জাহাজ ডুবির অসদ্ভাব ছিল না। এর আগে আর পরে যে সব পার্শেল পাঠিয়েছিলাম সব গুলিরই পৌঁছান সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু এ চামড়ার অনেক দিন কোন সংবাদ না পাবার পর হৃদয়বিদারক সংবাদ এল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শেলটি হারিয়ে গিয়েছে! হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এমন শোকাবহ; এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—হূণ পাশবতাই এই ক্ষতির মূল কারণ!

১লা অক্টোবর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

আহত হিংস্র জন্তুকে—যেমন বাঘ ভল্লুক কিম্বা চিতাকে—অনুসরণ করা বিপদসঙ্কুল। এ কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করতে হলে, আপনাকে এবং অনুচরবর্গকে রক্ষা করতে হলে, সাবধানতা ও বহুকাল অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার বিশেষ আবশ্যক। অনুচরবর্গকে রক্ষা করার দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিতে হয়। কেননা তারা আত্মরক্ষার যোগ্য অস্ত্র ধারণ করে না, এমন কি অনেক সময় কোন অস্ত্রই তাদের থাকে না। সর্ব্বতোভাবে তার আত্মজীবন রক্ষার জন্যে তোমারই উপর নির্ভর করে। শিকার ব্যাপারে দৈবাৎ কিছু ঘটে না। যদি কোন বিপদ হয় তবে নিশ্চয় জেনো সেটা অজ্ঞতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুঃসাহসিকতার পরিণাম। এত দিন ধরে আমার চিঠি পড়ে তোমরা এটুকু জেনেছ বোধ হয়, দুরন্ত হিংস্র জন্তু শিকার করতে হলে, কেমন জায়গায় দাঁড়িয়ে এ কাজ করতে হবে, সে স্থানটা বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনার সহিত স্থির করা প্রথম এবং প্রধান কাজ। আর সব দিকেই দৃষ্টি রেখে গুলি করবে, অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে না। বন্দুক আওয়াজ করবার পর আর কোন শিকারী যাতে কিছু মাত্র শব্দ না করে, সে বিষয়ে কড়া হুকুম দেবে। আর যাতে এ আদেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয় সে সম্বন্ধে মনোযোগী হবে। আজ পর্য্যন্ত আমি এই নিয়মে চলেছি আর যে মৃগয়া ক্ষেত্রে আমার একচ্ছত্রী অধিকার সেখানে কখনই এই নিয়ম ভঙ্গ হতে দিই নি। তার পর আমার বাঁশীর সঙ্কেতে তারা জানতে পারে শিকার ফসকেছে, ঘায়েল হয়েছে কিম্বা ঘায়েল হবার পরে পালিয়ে গিয়েছে। চার দিক নিঃশব্দ থাকলে আহত জন্তু অধিক দূরে যায় না, নিকটে আড়াল আবডাল দেখে লুকিয়ে বসে থাকে। কিন্তু সোরগোল যদি চলে তবে প্রাণপণ শক্তিতে যতদূর সাধ্য তত অধিক দূরে যায়। খুব সম্ভব সে দৃষ্টির মধ্যে কাছেই থাকে, কিন্তু সেখানে শেষ গুলি মারবার সুবিধা হয় না। তাই জন্যে নড়াচড়া, কথা কওয়া, তোমার কৃতকার্য্যতা অথবা তোমার জীবনের পক্ষে হানিকর হতে পারে। যদি তোমার বন্দুকবাহক অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে তাকে এমনি শেখাবে যে সে যেন, টুঁ শব্দটী না করে।

এ সম্বন্ধে তোমাদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি একবার মস্ত একটা চিতা বাঘকে ঘন বনের মধ্য হতে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবামাত্রই গুলি করেছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমা হতে দু'চার পা দূরে আমার দিকে পিঠ করে সে পড়ে গিয়েছিল। কাছেই গুটি কত বাবুলগাছ। চারি দিকের ঘাস এক ফুটের বেশী উঁচু নয়। হাত চল্লিশেকের মধ্যে তার লুকিয়ে আশ্রয় নেবার দ্বিতীয় স্থান ছিল না। আমার আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। অনায়াসেই সে আমাকে আক্রমণ করতে পারত। তার মূর্ত্তি আর ভঙ্গী দেখে তার মনোভাবও যে তাই, সে কথা বোঝা যাচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা টান করে রেখেছিল। ঘাড়ের রোম সব উঁচু হয়ে উঠেছে, কাণ দুটি খাড়া, লেজটী শুধু ঈষৎ নড়ছিল। আমি দেখলাম এক গুলির চেয়ে, দুই গুলিই বেশী কাজের হবে। সমস্ত ক্ষণ বাঘের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বন্দুকের ডান দিকের নলে গুলি ভরছি! (ভেবো না কাজটি বড় সোজা!) এমন সময় দলের এক জন শিকারী গাছের উপর হ'তে হঠাৎ বলে উঠল,—"ওবে উঠছে গুলি কর, গুলি কর।" খুব সম্ভব আমার চেয়ে বাঘের দুরভিসন্ধি সে ভাল করে বুঝতে পেরেছিল। এমন অবস্থায় যে কখনো পড়েছে সেই জানে কি ভয়ানক আক্রোশের সঙ্গে বাঘটা উঠে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি বন্দুক নামিয়ে গুলি করে যখন দেখলাম সে আবার ধরাশায়ী হয়েছে তখন কি শান্তিই বোধ

হল! তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হবার ইচ্ছায় একটু এগিয়ে অন্য নলটিও তার উপর খালি করলাম। আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে যখন সে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছিল সে ভয়ঙ্কর রব দু'শ হাত দূরে হতে স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। বিপিন যদি না চেঁচাত (তোমরা তাকে চেন) আমি অনায়াসেই কার্য্য সমাধা করতে পারতাম; বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটাও অনর্থক নষ্ট করতে হ'ত না। সেটা তোলা থাকত, পরে বিশেষ দরকারের সময় কাজে লাগাতে পারতাম। বেচারী বিপিন বেয়াকুবী করে ভারি দুঃখিত আর লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। একবার শিক্ষা হলে পর আর কখনো এমন করে নি।

বাঘ কিম্বা চিতা যদি খুব নীচু হয়ে চলে কিম্বা ভুঁয়ে শুয়ে পড়ে তা হলে তুমি যত তীক্ষ্ণদৃষ্টিই হওনা কেন সহজে তাকে খুঁজে পাবে না। মনে রেখো, তার নিজের মনোনীত স্থানে, তোমার তাকে খুঁজতে হয়। খোলা জায়গায় রক্তের ধারা কিম্বা পায়ের চিহ্ন দেখে কখনো আহত জন্তুকে অনুসরণ করা উচিত নয়। অনেক অনুচর সহচর সঙ্গে থাকলেও এটা করা অবিবেচনার কাজ। বন্দুক ঘাড়ে, কুচ-করা সেপাহীর মত দলবদ্ধ হয়েও এ কাজে অগ্রসর হওয়া অন্যায়। এ ভাবে অনেকবার অনেক বিপদ ঘট্‌তে শোনা গিয়েছে। কারণ আহত জন্তুটি যে কোন পথে, কি ভাবে কখন এসে পড়ে, তারি নিশ্চয়তা থাকে না। যদি চারি দিক নিঃশব্দ হয়, বাক্যালাপ একেবারে নিষিদ্ধ হয় তাহলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় আহত জন্তু নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আর কিছুক্ষণ যদি অপেক্ষা কর তাহলে দেখবে হয় সে মৃত, নয় এত দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছে যে নির্ব্বিঘ্নে অবাধে তার কাছে এগিয়ে যেতে পার। Nemo me lacesit--আমায় একলা থাকতে দাও—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" ভাবটাই তার মনে তখন প্রবল হয়। তাই অকারণে উত্যক্ত বোধ করলে, সম্ভবতঃ আক্রমণকারীর উপর প্রতিশোধ তুলবার চেষ্টা করে। এ সব সময় আমি কি করি জান? প্রথমে শিকারী ও অনুচরবর্গের একটা মন্ত্রণা সভা হয়, তার পর চাকার মত গোল পথে তাদের অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিই। প্রথমে তারা দেখে আসে কত দূরে সে গিয়েছে, তার পর ক্রমে এই গোল পথটী খাট করতে করতে আসি। যদি পথে বেতবনের বাধা পড়ে, তা হলে বনের মধ্য হতে তাকে বার করে নিয়ে আসবার জন্যে দু একটী হাতী থাকলে কাজটা সহজ হয়। হাতীর অভাবে শিকারীদের দলবদ্ধ করে হাতে মস্ত মস্ত এক একটা বাঁশ দিয়ে পাঠান ভাল। দূর হতে বাঁশের খোঁচায় তারা বেতবন হতে বাঘকে বার করে নিয়ে আসতে পারে। পাহাড়ে জায়গায় নালার মধ্যে এক দল মোষ তাড়িয়ে পাঠান সব চেয়ে নিরাপদ পন্থা। এ অবস্থায় নালা কিম্বা নদীর ধারে ধারে নিজে বন্দুক ঘাড়ে খুঁজতে যাওয়া আত্মহত্যারি সামিল। এমন করে কত জনের যে কত বিপদ ঘটেছে সে কথা আর বলবার নয়। পাথরের ঢিবির পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে জন্তু লুকিয়ে বসে আছে, সে তোমার গন্ধ পায় আর তোমার পদশব্দ ভাল করে শোনে। সে নিজে মস্ত শিকারী। একটু শব্দ হতে না হতে সেই দিকে ফিরে দেখে। এ বিষয় তুমি নিজে পরখ করে নিতে পার। তোমার কুকুরকে মার সে আরো-শাস্তির হাত এড়াবার জন্যে টেবিল কিম্বা কৌচের নীচে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তার পর তুমি যত নিঃশব্দে আস্তে আস্তে পা ফেলে তার দিকে যাবার চেষ্টা করবে দেখবে সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তোমার দিকে দেখছে।

ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক সবারই সম্বন্ধে এই এক কথাই খাটে। তবে ভল্লুকরাজ শ্বাপদ জাতির মত অতটা চতুর নয়। এ ছাড়া শ্বাপদের আর একটি বিশেষ সুবিধা, সে অতি সামান্য আড়ালের কিম্বা প্রস্তর খণ্ডের পিছনে আত্মগোপন করতে পারে। তুমি তোমার বন্দুক ব্যবহারে যতই ক্ষিপ্র হওনা কেন, হঠাৎ

অতর্কিত ভাবে তোমার উপর এসে পড়ে কাজে বাধা দেয়। নিজে কোন গাছ কি বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে থেকে, চারি দিকে নজর রাখবার জন্যে গাছে মানুষ চড়িয়ে দেওয়া ভাল। আর মাঝে মাঝে সম্ভবপর জায়গাগুলিতে ঢিল ছুঁড়ে সন্ধান নেওয়া মন্দ বুদ্ধি নয়। তবে সময়টা যদি সন্ধ্যার প্রাক্কাল হয় তাহলে পর দিন প্রত্যুষের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকাই সুবুদ্ধির কাজ।

আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। উৎসাহের বশে মৃতপ্রায় বাঘ কিম্বা চিতার বেশী কাছে কখনো এগিয়ে যেয়োনা। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে অনেকে বিপদে পড়েছেন। চলচ্ছক্তি-রহিত মৃতপ্রায় বাঘের শরীরে মৃত্যুর যথার্থ লক্ষণ আবিষ্কার করা সহজ কথা নয়। শরীরটা যখন একেবারে অসাড় নিস্পন্দ দেখায় তখনও আর এক গুলি মেরে দেখা ভাল। নয়ত বন্দুকটা ঠিক রেখে দূর হতে বর্শার খোঁচা দিয়ে পরখ করে নিলে ক্ষতি নেই। আমার এক শিকারী বন্ধু গল্প করেছেন বাঘকে মৃত মনে করে, হাতীর পিঠে তুলে বেঁধে নেবার পরও বেঁচে উঠতে দেখা গিয়েছে! মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে তার উত্তমাঙ্গ চূর্ণ করে তবে রক্ষা পায়। কয়েক বৎসর আগে কর্ণেল ‥আমায় বলেছিলেন একবার এই রকম একটা বাঘ হঠাৎ বেঁচে উঠে বাঁধন দড়ি সব ছিঁড়ে ফেলে! হাতী আতঙ্কে অধীর হয়ে চীৎকার করতে করতে দৌড় দেয়। তার পর বাঘটা পাশেই এক পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। মাথায় শক্ত আঘাত লাগায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন এক জন তার ঘাড়ের কাছে গুলি করে তাকে নিঃশেষ করেন। পরে পরীক্ষায় আবিষ্কার হল প্রথম গুলি তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে নি,—শুধু সামান্য একটু ছিদ্র করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল মাত্র।

প্রথম প্রথম যখন শিকার করতে আরম্ভ করি, সেই সময়ের একটী ঘটনা হ'তে আমি এই অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলাম। গুলির আঘাতে বাঘটি ধরাশায়ী হবার পর ম—দাদা তাকে টেনে বার করবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু চেহারা দেখে তার মৃত্যু সম্বন্ধে আমি তখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারি নি। আমার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি তার উপর আর এক গুলি মারতেই এই মৃতবৎ জন্তুটি হুঙ্কার ছেড়ে লম্ফ দিয়ে উঠে তবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল! ভাগ্যবশতঃ আমরা পশ্চাতে ছিলাম। নতুবা শুধু তর্কের মীমাংসা নয়-- সত্বর সদ্গতির পথে সে আমাদের অগ্রসর করে দিত! আর এক বার এমনি অবস্থায় পরিণাম কিন্তু শুভ হয় নি। শিকারীরা এসে চারি দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। দুই এক জন উৎসাহী যুবক বাঘটিকে টেনে বার করবার জন্য উৎসুক। দীর্ঘ বর্শা দিয়ে বেত বনের মধ্যে বার বার খোঁচা দিচ্ছে। এই ব্যবহার আমার মনোমত হয়নি। তাই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। যে জন্তুটিকে একেবারে বাসি মড়া বলে বোধ হচ্ছিল চক্ষের পলকে ঝাঁপিয়ে উঠে সে আমাদের আক্রমণ করলে! যেন তার কিছুই হয় নি! ভাগ্যে আমি এগিয়ে ছিলাম। বন্দুকের মুখ তার মুখের উপর রেখে সম্বর্দ্ধনা করলাম। তাকে আর এগোতে হলো না। যে সব শিকারীরা এতক্ষণ লম্ফঝম্প করছিলেন আতঙ্কে পালাবার পথ দেখতে না পেয়ে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন! আর যাঁরা বেতবনের মধ্য দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ বেতসের আলিঙ্গনে রক্তরাগে সুশোভিত হল। তন্বী এই বনবল্লরীটি পত্রবিহীন, কিন্তু প্রসারিত কণ্টকিত শাখা বাহু দিয়ে যখন স্বাগত জানায়, সে হর্ষ স্পর্শে আগন্তুকের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব

হয়! বহু দিন যাবৎ তার নিদর্শন শরীর ও মন হইতে মিলায় না। জমির দখল নিয়ে অনেক দিন ধরে যখন লড়াই চলে,—আইনের অনিশ্চয়তা আর বিচারের দীর্ঘসূত্রতাই তার প্রধান কারণ—তখন দেখা যায় যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ অস্ত্র স্বরূপে বংশ দণ্ডে বেতসবল্লী জড়িয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় আর নির্ব্বিচারে চারিদিকে আস্ফালন করতে থাকে। বাবরীধারী লাঠিয়াল প্রাণ গেলেও এই অপরূপ অস্ত্রের সম্মুখীন হতে চায় না। কেননা একবার যদি অস্ত্রটী তার সযত্নরক্ষিত কেশদামের সংস্পর্শে আসে, তবে আর তার লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকে না।

এক গুলিতেই শিকার, বাঘ কিম্বা চিতা, ভাল্লুক অথবা বন্য মহিষ এক গুলিতে ফরসা হয়ে গিয়েছে বলতে বেশ, ভাবতেও গৌরব কম নয়। অন্যে এ অহঙ্কারটুকু করলে আমার শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু আমার নিজের সময় সন্দেহমাত্র থাকলে এ আনন্দ আর এ গৌরব আমি শিকেয় তুলে রেখে এক গুলির চেয়ে দুই গুলি ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। তোমায় এ "মুকলিস্" সুখসম্ভোগের আমি পরামর্শ দেব না। আমার কাঁচা বুদ্ধির দিনে আমি একবার এক বাঘকে ধরাশায়ী করে সেটিকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য লোক ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, মাটীর উপর খানিকটা জমাট রক্ত রেখে সে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছে! চারিদিকের বনঝাড় পিটিয়ে ওলট পালট করে, সম্ভব অসম্ভব কত জায়গায় কত খুঁজে কোথাও আর তার দেখা পাওয়া গেল না। তার এই তিরোধান-দুঃখ আমি এখনও ভুলতে পারি নি। এই কথাটী কখনও ভুলনা, যে শিকারকে যত শীঘ্র পার একদম মেরে ফেলতে হবে; এতে "কার্ত্তুস্" খরচের কৃপণতা করলে চল্‌বে না। এ যদি করতে পার তাহলে আহত শিকার অনুসরণ করবার প্রয়োজন হবে না। বিপদের মুখে পড়বে না; কাজেই দুঃখের কোন কারণও ঘটবে না।

আহত জন্তু যে সর্ব্বদাই বিপদজনক হয় তা নয়, বরং অনেক সময় অতিশয় ভীরুর মতই ব্যবহার করে। আমাদের বহু পুরাতন প্রবাদে নখী, দন্তী, শৃঙ্গীকে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য বলে যে উপদেশ আছে সেটা মেনে চলাই ভাল। কিন্তু যতটা ব্যবধানের বিধান আছে সেটা তুমি অনায়াসেই অমান্য করতে পার।

২৪শে নভেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মাঝে আমার পত্র ব্যবহার বন্ধ হয়েছিল। তার কারণ আমি অক্টোবর মাসে ও তার পরে মৃগয়াভিযানে অরণ্য যাত্রা করেছিলাম। সেখানে শিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহে জ্বরাসুর প্রবেশ করেছিলেন। রাজধানীর সুসেব্য জল বাতাসে এসে সে আমায় এম্নি পেয়ে বসল যে বহুকাল ধরে আর ছাড়তেই চাইল না। মহিষাসুর সংহার করবে আর জ্বরাসুর তোমায় ছেড়ে কথা কইবে এত সুখ এক কপালে লেখে না। তবু আমি বলি মহিষাসুর পরাজয়ের সৌভাগ্য যদি ঘটে তবে জ্বরাসুর দু'চার দিন দেখা দিয়ে গেলে ক্ষতি কি? আশ্চর্য্য এই যে বনে জঙ্গলে নানান অসুবিধার মধ্যে যত দিন বসবাস কর ততদিন সে চুপচাপ করে থাকে, কিন্তু যেই গৃহের আরাম ও শান্তির মধ্যে ফিরে এস অম্নি সে নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। তাকে প্রচুর পরিমাণে কুইনীন ভোগ আর স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সুখ উপভোগ কর্‌লেই তার প্রকোপ দূর হয়। দুঃখের অভিজ্ঞতা হ'তে যে জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে তাতে এখন

জেনেছি শিকার-শিবিরে অবস্থিতি কালে প্রতিদিন প্রভাতে ঈষৎ পরিমাণে কুইনীন্ সেবন করলে এ কষ্টের হাত সহজেই এড়ান যায়। যাক্ সে সব কথা পরে হবে। এখন আমি বাঘের কথা বলি। এই চমৎকার কথা শেষ করে, তবে অন্য আর সব প্রাণীর কাহিনী তোমাদের বল্‌ব। বাঘ যেখানে কোন জীব হত্যা করে রেখে যায় সেই খানে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকা, তার সাক্ষাৎলাভের সব চেয়ে ভাল উপায়। স্থান বিশেষে এ ভিন্ন আর কোন উপায়ই নেই। তবু নৈরাশ্যের কারণ ঘটাও আশ্চর্য্য নয়। সে সম্বন্ধে দু' একটি উপদেশ শুনে রাখা ভাল। জীববলির লোভ দেখিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলা শক্ত কাজ নয়।

স্থানীয় লোক, যারা হয়ত শিকারের কায়দা কানুন কিছুই জানে না, কিন্তু জন্তুটি যে জায়গায় বাঁধলে বাঘ এসে দেখা দেবে সে কথা তারা ঠিক বলতে পারে। বলদই বাঁধ আর মহিষই বাঁধ তাতে বড় একটা আসে যায় না। তবে মহিষ বাঁধতে হলে বাচ্ছাই ভাল। বাঁধন দড়ি গলায় দেবে, কি ছাঁদন দড়ি পায়ে দেবে, তাতেও বড় কিছু প্রভেদ হয় না। তবে দিনের প্রথম দিকে কাজটা করা ভাল। বাঘের মত জোয়ান জানোয়ারেও ছিড়তে পারে না এমন শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধাটা কিছু নয়। প্রথমে সে জন্তুটির উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তাকে মারে, তার পর তাকে কিছু দূর টেনে নিয়ে যেতে ভালবাসে। যদি শক্ত বাঁধনের জন্যে টেনে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে সে এক খণ্ড মাংসও খায় না। আর এমন হতে পারে যে আর সেখানে সে ফিরে আসে না। অল্পদিন আগেকার কথা, একটা বাঘ এম্নি দড়ি ছিড়তে না পেরে বলদের মাথাটা একেবারে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে তার পর তার ধড়টা টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বাঘের মত সন্দিগ্ধস্বভাবের জন্তু আর দুটি নেই। সে সব জিনিষকে আর সমস্ত জীবকেই সন্দেহ করে। মৃত কি জীবিত সে সম্বন্ধে নির্ব্বিচার। এই খানেই তার বিচার শক্তির দুর্ব্বলতা। আমি তোমায় আইন ব্যবসায়ী হতে পরামর্শ দেব না; বিশেষতঃ জজ হতে কখনই বলব না। কেন না তাদের সব দোষের মধ্যে এই নির্ব্বিচার বুদ্ধিই সব চেয়ে প্রবল। সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি—বলা উচিত ছিল সব গুণের মধ্যে এই নির্ব্বিচার গুণই সমধিক শক্তিমান। শাস্ত্রানুশাসনের ছন্দানুবর্ত্তন না করে আমি কোন কথা কইনে। তাই এখানে অধ্যায় এবং শ্লোক দুই উদ্ধৃত করছি। লর্ড ম্যাকনাটন কি বলেন একবার শোন।—"রাজ সামন্তগণ (Lords) কলিকাতায় উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচার গ্রাহ্য করিতে অসমর্থ। পণ্ডিত বিচারকগণ সমস্ত ব্যাপার সকল ব্যক্তি সম্বন্ধেই, কি জীবিত কি মৃত, সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন! যে কেহ এই কার্য্য সংস্রবে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিয়াছে সে জীবিত কিম্বা মৃতই হোক বিচারকগণ তাহাদের প্রত্যেককে এবং সকলকেই সাধারণ ভাবে নির্ব্বিচারে সংশয় দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।" I. L. R. Calcutta Series, Pages 684··693.

উদ্ধৃত অংশের আর ভাষ্যের প্রয়োজন আছে কি? ব্যাঘ্রের বিচারশক্তি সংম্বন্ধে অবিকল এই কথাই বলা চলে।

উপঢৌকনস্বরূপ যে জীবন্ত জন্তুটি তাকে উপহার দেওয়া হয় তার বন্ধনবিধি কিম্বা তার আকার অবয়বের যৎ সামান্য বৈলক্ষণ্য যদি থাকে, তবেই সে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হয়ে উঠে। মৃত জন্তুটিকে যদি ঈষৎ স্থানান্তরিত কর তাহলেও সে সংশয়ব্যাকুল হৃদয়ে পলায়ন করে। তুমি যতই কষ্ট ভোগ করে, গাছের আগডালে পথ চেয়ে বসে থাক না তার দেখা আর পাবে না। দিন দুপহরে মাঝে

মাঝে সে মৃতজীবের পাশ্চর শৃগাল শকুনির পাল তাড়িয়ে দেবার জন্যে এসে দেখা দেয়। যদি সে পূর্ব্ব সংস্থানের অকারণ সামান্য ব্যতিক্রমও দেখে তাহলে সেই যে চলে যায় আর প্রায় ফিরে আসে না।

সাধারণতঃ মৃত জন্তুটিকে সে কিছু দূর টেনে নিয়ে যায়। কখন কখন গৃধিনী শকুনির কবল হতে রক্ষা করবার জন্যে বহুদূরেও নিয়ে রাখে। মাচানে উঠবার সময় যদি বোঝ রাতের ছায়ায় কিম্বা চাঁদের আলোতে মৃত জন্তুটি ভাল করে দেখবার অসুবিধা হবে, তাহলে যেখান হতে দেখা সুবিধা-জনক দু'চার হাত দূরে তেমন জায়গায় একটু সরিয়ে নিয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। তবে সাবধান, যেমন ভাবে ছিল অবিকল সেই ভাবেই রেখো। তার কিছু বদল কোর না। এই একই সুবিধার জন্যে যদি পার নিঃশব্দে আড়াল-করা দু একটি ডালপালাও সম্মুখ থেকে ভেঙ্গে দিতে পার। যারা তোমার মাচানে যাবার পথে সঙ্গী হবে তারা যেন একেবারে বোবা হয়ে থাকে; অন্ততঃ একশ হাতের মধ্যে কেউ যেন এ নিয়ম ভঙ্গ করে না। চাঁদনী রাতেও বনে জঙ্গলে আলো ছায়ার এমন লুকোচুরি খেলা চলে যে এই যেখানে আলো ছিল পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে সেখানে অন্ধকার ঘিরে আসে—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যা কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সমস্ত অদৃশ্য হয়ে যায়—রাত্রি তাঁর নিবিড় নীলাঞ্চল দিয়ে সহসা সব ঢাকা দিয়ে ফেলেন।

সচরাচর বাঘটিকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যে বনের এদিক ওদিকে দু'চারটি জন্তু বাঁধা হয়। আর অধিকাংশ সময়ই একাধিক মারা পড়ে। যদি তোমার সঙ্গে বন্দুকধারী দ্বিতীয় সঙ্গী না থাকে তাহলে এর মধ্যে একটিকে রেখে, অন্য মৃত জন্তুটি সরিয়ে ফেলে তার স্থানে জীবন্ত আর একটি বেঁধে জীবিত বাকী সব গুলিকে স্থানান্তরিত করবে। নূতনটি মারা পড়ে নিশ্চয়ই পরদিন তোমার শিকারের সুবিধা করে দেবে। বেশী দিনের কথা নয়, ভ্রমবশতঃ আমি একবার একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রবীরকে হাত করবার সুযোগ হারিয়েছিলাম। আমাদের শিবিরের অনতিদূরে একটা জন্তু বাঘে মেরে রেখে গিয়েছিল। আমি পায়ে হেঁটে তার খোঁজে যাব স্থির করি, কিন্তু আর সকলের সম্পূর্ণ ভিন্ন মত হওয়ায় আমি আর আমার এক বন্ধু বেলা সাতটার সময় হাতীতে চড়ে খুনীর তল্লাসে বেরুলাম। বেশী দূর আমরা যাই নি। পাহাড়ের জঙ্গলে এ অবস্থায় যে পরিমাণ শব্দ হয়, তাই শুনে সে যে কোথায় পলায়ন দিলে আর তার টিকিও দেখা গেল না। সে যে তখনই মাংস ভোজন সমাধা করে গিয়েছে তার নিদর্শন সব ছিল। যে পথে দ্রুত পলায়ন করেছে সেখানেও বৃহৎ পদচিহ্ন সুস্পষ্ট। বেলা ন'টার সময় কতকগুলি লোক সঙ্গে করে আমি মাচান বাঁধাতে গিয়েছিলাম। একটু আগেই বাঘের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দেখে বন্দুকটা সঙ্গে নিই নি। জঙ্গলে যেতে এমন ভুল আমার আর কখনও হয় নি। যারা আমার সঙ্গে ছিল তাদের একটু দূরে রেখে, আমি মৃত জন্তুটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় যতটা সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক, আমি তার কিছুই করি নি। শুধু বাঘ যে পথে এসেছিল আমি তার বিপরীত পথে যাওয়া ভিন্ন আর কোনরূপে সাবধান হই নি। সেখান হতে গজ ত্রিশেক দূরে আমি চুপি চুপি বাঁশঝাড়, খাট গাছ ও পাথরের আড়ালে আড়ালে যখন যাচ্ছিলাম তখন মনে হল কি যেন একটা নড়ল। তার পরে সম্মুখে একেবারে চোখের ওপরে দানব প্রমাণ একটা বাঘ দেখতে পেলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আহার সমাধা করেছে। ওর বিশ হাত পথ পাহাড়ের গা বেয়ে সে উপরে উঠে গেল। তখন বন্দুক হাতে থাকলে লক্ষ্য যে অব্যর্থ হত, নিঃসন্দেহ। যত সতর্কতা ও

সাবধানতা আমার জ্ঞানে ছিল সব প্রয়োগ করে অতি ধীরে নিঃশব্দে মাচান ত বাঁধা হল। আমরা রাত ন'টা পর্য্যন্ত সেখানে প্রতীক্ষা করে বসে রইলাম। সে তখনও দেখা দিলে না। সারা রাতের মধ্যে একটি বারও এল না।

পর দিন ক্রোশ খানেক দূরে "পথহারা" একটী মহিষশাবক হত্যা করেছে শুনে, আর অত সামান্য পরিমাণ কোমল মাংসে তাহার উদর ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেনা—বিশেষতঃ পূর্ব্ব রাত্রে সে উপবাসী ছিল—জেনে, আমরা তারই কাছে একটী প্রায়-বৃদ্ধ মহিস বন্ধন করলাম। এটী হত্যা হল, কিন্তু এমনি মরা গিঁট দিয়ে বাঁধা ছিল পাশব বল প্রয়োগ করেও বাঘ সেটীকে পাদমেকং নড়াতে পারে নি। শাবকটীর মস্তক আর দুই একখানি অস্থি ভিন্ন সমস্তই সে সমাধা করেছিল। বড়টী যেখানে বাঁধা ছিল তারই হাত দশেক দূরে এ সব পড়ে ছিল। মাচান যেখানে বাঁধা হল সেখান হতে বৃদ্ধ মহিষটীর মৃত দেহ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাঘ যদি দয়া করে সে পথে আসত তার পালাবার আর কোন পথ ছিল না। "ভ্রান্তি বিনোদ" (Comedy of Errors) তখনও সাঙ্গ হয় নি। মহিষশিশুর আমিষ ভোজ কতকটা সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। চোখে না দেখে কাণেশোনার উপর নির্ভর করে কাজ করলে ভ্রম প্রমাদ ঘটবারই সম্ভাবনা। আমার ভ্রান্তি বিনোদের এই দ্বিতীয় অঙ্ক।

এ কথা যদি আগে জানা থাকত তাহ'লে তার পাশে মাচান বাঁধালেই চলত; কিম্বা বৃদ্ধ মহিষকে শাবকের পাশে স্থান দিলেই হ'ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহ'লে বাঘ একটীর সন্ধানে অন্যটীর সন্নিধানে এসে উপস্থিত হ'ত। সাতটার কিছু পরে এক জোড়া পাখী আমার মাচানের কাছে ডাকতে আরম্ভ করলে। দুধারে দুটীর সুর সাধনা চল্‌ল। আমার মনে হল, মাচান বাঁধার শব্দ যদি বাঘের কাণে গিয়েও থাকে তাহ'লেও এই গানের সুরে তার সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর বাঁ'দিক হতে একটী রাত্রিচর পাখী বলে উঠল, "হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার।" অনতি বিলম্বে শার্দ্দুল-প্রবরের সাবধান গুরু পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তার বীরদর্পের কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হ'ল। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসবার পর প্রথমে হাড়ের মালা নাড়া দেবার মত একটা খড় খড় আওয়াজে বুঝলাম মহিষ শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি মাংসের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হচ্চে। তাহার পরেই আহারের মচ্‌ মচ্‌ মচ্‌ মচ্‌ শব্দ, মাঝে মাঝে অর্দ্ধ মাত্রা, সিকি মাত্রার বিরাম। সে সময় শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ ত্যাগ করে, রসাল স্বাদু মাংসের গ্রাসে মুখবিবর পূর্ণ করা হচ্ছিল আর কি, হাত-ঘড়িতে দেখলাম ঠিক একটী ঘণ্টা এই ভোজন ব্যাপার চলল। সেখানে বসে সে এই ভোজন কার্য্যে নিবিষ্ট ছিল তা শুধু আমি কাণে শোনা হতেই অনুমান করেছিলাম, চোখে দেখতে পাই নি। আমার মাচান যেখানটীতে ছিল সেখান হতে বহু চেষ্টা, অনেক উঁকি ঝুঁকি মেরেও এই ডোরাকাটা প্রাণীটীর কিছুই দেখা ঘটে ওঠে নি। এক ঘণ্টা পরে আহার সমাপ্ত করে পরিতৃপ্ত ব্যাঘ্ররাজ স্বীয় অভীষ্ট পথে যাত্রা করলেন। তার সঙ্গে এ উৎকণ্ঠিতের আর সাক্ষাৎ হল না। প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি আহার শেষে আচমনে কিম্বা জলপানে গিয়েছেন। আমি "পুনর্‌ দর্শনায়" বসে রহিলাম।

ফিরে এলেন বটে কিন্তু প্রথমের কাছে নয়। দ্বিতীয়ের কাছে ফিরে এসে শয্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর শান্তিদ্যোতক জৃম্ভণ-শব্দ কর্ণগোচর হল। যদিও আমি প্রহরার্দ্ধ কাল ব্যাকুল চিত্তে প্রতীক্ষা করে রইলাম কিন্তু একটীও রাজকটাক্ষ প্রথমের দিকে পতিত হল না। তৎক্ষণে কিম্বা তৎপরে কখনই হয় নি। ভোগ্য বস্তু তিনি আর কখনও স্পর্শ করেন নি।

১৫ফিট ঊর্দ্ধে মাচান বাঁধবে, এই হচ্ছে বিধান। কেউ আপন আপন রুচি এবং পদগৌরব অনুপাতে উন্নততর স্থানে মাচান বেঁধে থাকেন। আমি কিন্তু ততটা উন্নতির পক্ষপাতী নই—১২ ফিটই আমার যথেষ্ট মনে হয়। আর চিরন্তন প্রথামত মাচানের সম্মুখে ডালপালার পর্দ্দা আঁটা আমি ভালবাসিনে। দূরে হতে এমনতর মাচান একটি অন্ধকার সন্দেহজনক স্থান বলে বোধ হয়, দেখতেও ভাল হয় না। মনে হয় চাষার ক্ষেত পাহারা দেবার কুঁড়ে, শুধু চালখানি উড়ে গেছে। মাচানের সম্মুখে দু'একটি ডাল বুদ্ধি করে সাজিয়ে দিতে পারলেই কাজ চলে, অপর পক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এড়ান যায়। এইটিই হচ্ছে আসল কথা। মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়ত মাচানে বসেই শিকার কর, অপর পক্ষের নজর না পড়ে। সেইটি করতে পারলেই হ'ল। এই সে দিন আমার একজন বন্ধু এই কারণেই ভাল্লুকের পাল্লায় পড়েছিলেন। গুলি করে উৎসাহের মুখে ভুলে গিয়ে নীচু মাচানের উপর নড়াচড়া করতেই ভাল্লুক টের পেয়ে খাড়া হয়ে চীৎকার করতে করতে তাঁর কাছে এসে পড়ে পায়ের জুতোর উপরে থাবা মারে। এই সুযোগে বন্ধুবর Paradox বন্দুকের নল একেবারে ঋক্ষের কপালের উপর রেখে তার ইহলোকের সব হিসাব নিকাশ করে' দেন! যদি নদী কিম্বা খালবিলের কাছে মাচান বাঁধ তবে, জেন ব্যাঘ্র খুব সম্ভব গোধূলি লগ্নে নয়ত প্রহরেক রাত্রির মধ্যে এসে দেখা দেবে। এর চেয়ে অধিকক্ষণ তার প্রতীক্ষায় বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রেডিয়ম্ আলোক সম্প্রতি ব্যবহার হচ্ছে। পূর্ব্বের অনেক উজ্জ্বল আলোকের চেয়ে এটী ভাল। আর যাঁর যা ইচ্ছে হয় তাই ব্যবহার করতে পারেন, তুমি রেডিয়ম্ আলোতেই সন্তুষ্ট থেকো।

যে রকম বন্দুকই ব্যবহার কর, আগে হতে যদি এ আলো তাতে লাগান না থাকে তবে অবিলম্বে একটি লাগিয়ে নেওয়া ভাল। অবশ্য বন্দুক তৈরির সময় লাগালেই ভাল হয়। তাহলে ফরমাস দেবার সময় তোমার আবশ্যক মত নিখুঁত করিয়ে সব করে নিতে পার।

চিঠি শেষ করবার আগে একটী কথা তোমাকে বলে রাখি। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, বাঘকে প্রলোভন দেখাবার জন্যে যে জন্তুটি বেঁধে দেবে তাকে মারা দূরের কথা, হয়ত সে সেদিকে দৃকপাতও করে না। তার পাশ দিয়ে চলে যাবে তবুও স্পর্শও করবে না। উপরি উপরি দুরাত একটি বাঘ এম্নি একটি জন্তুর পাশ দিয়ে জল খেতে গিয়েছে, তাকে কিছুই বলে নি। দুরাত প্রতীক্ষার পর তৃতীয় রাত্রিতে বাঁধা বলদটির ভয় ও অস্থিরতা দেখে—বুঝলেন বাঘটি পাশ দিয়ে খাতির নদারত ভাবে যাচ্ছে। তখন তাঁর গুলিতে সে মারা পড়ল।

১লা ডিসেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,—

আমাদের দেশের বসতবাটী হতে করাত দিয়ে কাঠকাটার শব্দের মত বাঘের আওয়াজ অনেক বার তোমরা শুনেছ। আর যতদিন বাঘটি আমার গুলিতে মারা না পড়েছে তত দিন এ শব্দের বিরাম হয় নি। যখন আমার মৃগয়া চেষ্টা সফল হয়েছে তখন বহু বার তোমরা বহু ব্যাঘ্ররাজের মৃতদেহ সমারোহে আঙ্গিনায় আনীত হতে দেখছ। তার মৃত্যু বৃত্তান্ত বারম্বার শুনেও তোমাদের সে কাহিনীতে অরুচি হয় নি।

চিত্রক ব্যাঘ্র বড় বিচিত্র জন্তু। অন্যান্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষা চিত্রকের হত্যা ব্যাপারেই নানারূপ দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়তে হয়। গ্রামের চারি দিকে এরা আড্ডি পেতে থাকে। তোমার পোষ্যপুত্রের মত আদরের কুকুরটির লোভে সহসা শিবিরে এসে হাজির হয়। বহু মেষ, ছাগ, গোবৎস এবং গ্রাম্য শূকরশিশু নজর আদায় করে! মস্ত মস্ত গাই বলদও এদের হাতে অব্যাহতি পায় না। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন চিতা এসে বনের মধ্যে বেঁধে দেওয়া বলদ মেরে রেগে আপন আপন গুহাশ্রয়ে প্রত্যাগত হয়ে দিব্যি নিরাপদে বসবাস করেছিল। খোলা মাঠে ও গ্রামে কোথাও এই জন্তুর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। বেত বনে সুবিধা বুঝে এরা বেশ পালিয়ে বেড়ায়। লম্বা ঘাসে ঢাকা মাঠে "হাতী পর হাওদা" আবার তার উপর স্বয়ং আরোহী হয়ে এদের শিকার করতে হয়। অনেক শিকারী মনে করেন Rifle এর চেয়ে S. S. G. গুলি দিলে এদের ওষুধ ধরে ভাল। হাওদার উপর নিরাপদে বসে এ ব্যবস্থায় সুবিধা হলেও আমি এটার পরামর্শ দিই না। এদের মধ্যে কারো কারো আয়তন ৮ ফুটেরও অধিক হয়। যাঁরা এদের সঙ্গে বেশী কারবার করেন নি তাঁরাই এদের খাট করেন, হতশ্রদ্ধা করেন, কিন্তু আসলে এরা অশ্রদ্ধার পাত্র নয়। মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় বেশী বলেই এরা তাদের দেখে ভয় খায় না। এরা বাঘের চেয়ে সহজে আক্রমণ করে। তাই বাঘের ধরণ ধারণ মেজাজ মতলবের খোঁজ খবর রাখা যদি শিকারীর পক্ষে আবশ্যক হয় তা হ'লে এই চতুর নির্ভীক জন্তুটির অভিসন্ধি দুরভিসন্ধি, অভিরুচি অনভিরুচি সম্বন্ধে আরো অধিক সতর্কতা অত্যাবশ্যক। কিছু না করতেই সে গায়ে পড়ে লড়াই করতে আসে। গুলি লাগবার আগে বাঘ কখনও তোমার উপর চড়াও করে না। চিতার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তবে এমনও অনেক সময় দেখা যায় বটে চিতা ও বাঘ উভয়েই নিতান্ত ভীরুর মত ব্যবহার করছে। চিতা বেশী চটপটে। খুব অল্প সময় ও জায়গার মধ্যে ঘুরতে ফিরতে পারে। সাপের মত নিঃশব্দ গতিবিধি, নূতন পথ ধরতে ভারি মজবুত, আর অতি অল্প আড়ালের সুবিধা পেলেই এমনি গা ঢাকা দিয়ে থাকে যে তাকে সহজে খুঁজে বার করা ভারি মুস্কিল। মেয়ে চিতা পুরুষের চেয়ে আকারে ছোট হলেও বুদ্ধিতে বড় আর বেশী ভাল শিকারী। বাচ্চা হবার কিছু দিন আগে হতেই সে স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকে, আর এই দুর্ব্বৃত্তের হাত হতে নিজের সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করে। অধিক সাহসের সহিত আক্রমণ করে, নিরাপদ আশ্রয়স্থান সহজে ছাড়ে না। গতিবিধির সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক, কোন আড়াল অন্তরালের সুবিধা পেলেই সত্বর পলায়ন করে। বনের চারি দিকে সন্ধানের জন্য যখন সোরগোল সুরু হয় তখন সর্ব্বদাই দেখি স্বামীটা সঙ্গে থাকলেও সেই আগে বার হয়ে আসে, আর পুরুষ-ব্যাঘ্রও ভয়ে ভয়ে পত্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পুরোবর্ত্তী হতে তাকে কখনও দেখি নি।

বিশেষ বৃহদায়তন আর পূর্ণবয়স্ক না হলে আমি প্রায় চিত্রিনীদের হত্যা করি না। শাবক সম্বন্ধে, কি ছেলে কি মেয়ে, এই নিয়মই পালন করে থাকি। তবে বন বনের মধ্যে যেখানে এদের গুলদার পোষাকটী ছাড়া দূর হতে বড় একটা কিছু দেখা যায় না সেখানে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ বোঝা কঠিন। শাবক সংহতি হতেই স্ত্রী কি পুরুষ সহজেই জানা যায়। এদের রক্ষা করবার জন্য আমি অনেক সময় শিকারই বন্ধ করেছি। চিত্রিনীর গ্রীবাদেশটা চিত্রকের চেয়ে দীর্ঘ। চোখ যদি বেশ খুলে দেখ, ভয় যদি না পাও তাহলে আরো অনেক প্রভেদ অনায়াসেই দেখতে পাবে; কেন না প্রভেদ অনেক আছে

তবে সব কিছু বর্ণনা করে বোঝান সহজ নয়। বরাহ দম্পতির মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বিশেষ অভিজ্ঞ শিকারী ভিন্ন নবীনের চক্ষে পড়ে না। এই কারণে সে বরাহ জ্ঞানে অশ্বারোহণে তার পশ্চাৎ ধাবন করে অনেক সময় সেটাকে শূকরী আবিষ্কার করে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণের পূর্ব্বে বন্দুক ব্যবহার করতে শিখে অবধি একাল পর্য্যন্ত আমি এই বিচিত্র চিত্রক অনেক শিকার করেছি। সেই তরুণ বয়সেই দুচারটি আমার গুলিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আমার আরণ্য বিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড প্রবাসের তিন বৎসর ছাড়া অদ্যাবধি বাঘিনী আর ব্যাঘ্রশিশুর সম্বন্ধে বন্দুক সম্বরণ করেও এখন আমার নিয়মিত বার্ষিক শিকারে যত গুলি বাঘ মেরে আনি আমি প্রতি বৎসরই তত গুলি করে চিতা মেরেছি। আমি জানি কোন একটী লোক যিনি আপন জমিদারীতে সর্ব্বেসর্ব্বা, সময়ে অসময়ে যখন ইচ্ছা তখন নির্ব্বিচারে চিতা বাঘ, গণ্ডার, মহিষ শিকার করে সে প্রদেশটীকে একেবারে জীবশূন্য করে তুলেছেন। তাঁর বন্দুক আর বল্লম হতে যে জীবটী আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে সেও যে কোন্ সুদূর দেশে পলায়ন করেছে তার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা বিশ্বাস করি "সবুরে মেওয়া ফলে," তাঁর বিশ্বাস ছিল অন্য রকম তাই তিনি সব নিঃশেষ করে ফেলেছেন। "ষাট ষষ্টির দাস" আমাদের সাত ভাইয়ের মধ্যে যে সামান্য জমিটুকু আছে তাতে বন জঙ্গল, খাল, বিলের অভাব নাই। এখানে ব্যাঘ্র বরাহ বিচরণ করে, অসংখ্য হংস-কারণ্ডব আনন্দে বিহার করে। যখন আমার সারা হয়ে তোমার সুরু করবার বয়স হবে, তখন উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত তোমার পুরাতন প্রিয় জমিদারীতে দেখবে আমি অনেক ছোট বড় শিকার তোমার জন্য রেখে দিয়েছি।

সারা দিন গম্ভীর হয়ে মুখ হাঁড়ি করে থাকা আমার পছন্দ হয় না। কবির পোষা বেড়ালটীর মত শান্ত ধীর গম্ভীর জীবকে আমি প্রশংসার চোখে দেখিনে। একবার বনের মধ্যে তাঁবুর পাশে আমরা যখন সবাই মিলে আগুন পোয়াচ্ছিলাম সেই সময় একজন শিকারী গল্প করেছিল।—একবার একটী বন্য মার্জ্জারবর, বংশ গৌরবে তার চেয়ে অনেক উঁচু একটী চিতা-দুহিতাকে বিবাহ করেছিল, কুমারীর অভিমতে। পিতৃহীন মানব ভিন্ন মানুষের মধ্যে এই সৌভাগ্য সাধারণের পক্ষে সুলভ নয়। এই অপূর্ব্ব ঘটনা কেমন করে সম্ভব হল বল দেখি? এ সব জীবের মন ত কথায় ভেজান যায় না। তবে দিনরাতই যে বাঘিনী, তাকে মার্জ্জারপুঙ্গব মোহের বশীভূত করলে কিসে? স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এখন সব লোকের বাক্যবিন্যাস সুরুচির পরিচায়ক নহে। সে চিত্রক কন্যারই নিন্দাবাদ করলে। এমনটা যে সচরাচর ঘটে তা নয়, তবে এ ক্ষেত্রে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। যে গৃহস্থের ঘরে এই বিড়ালবীর লালিত পালিত হয়েছিল তার এমন অবস্থা ছিল না যে ঘরের ছেলেদের দুধ দিয়ে আবার বিড়ালের জন্যও কিছু রাখতে পারে। অবস্থা বোধ হয় "একপো দুধ কিনেছি কি হবে তা বল না?" সেজন্য দুধ টুকু ধামাচাপা রাখা হত। বাড়ীর গিন্নী ভাল গুলি অন্য কাজে লাগিয়ে ভাঙ্গাচোরা ধামাতেই এ কাজ চালাতেন। আধ আড়ালের মধ্য দিয়ে যা কিছু দেখা যায় শুনেছি তার প্রলোভন সমধিক; অন্ততঃ মার্জ্জারশ্রেষ্ঠ সেইরূপই মনে করেছিল। কাজের পরিণামের বিষয় কিছুই বিবেচনা না করে ভাঙ্গা ধামার মধ্যে গলা গলিয়ে দিয়ে দুধটুকু ত সে নিমেষে নিঃশেষ করলে। কিন্তু ধামাটী যে সেই গলা ধরে রইল কিছুতেই আর ছাড়ল না। এই আদরের আধিক্যে তার পাঁচ পরাণ আসি যাই করলে ও তার নিষ্কৃতি হল না। সবাই তাকে দেখে হাসে। মানুষ মার্জ্জার কেউ রেয়াত করে না। সবাই দুর ছাই

করে কেন। আত্ম রক্ষা করা তার পক্ষে দুর্ঘট হয়ে উঠল। মনের দুঃখে সে ঘর ছেড়ে বনে গেল। অনাহারে অনিদ্রায় শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎক্ষাম পীড়িত কঙ্কালসার পাণ্ডুবর্ণ!

জঠরজ্বালা দূর হলে মনের সুখে বেড়াল যেমন গরগর্ শব্দ করে তাই শুনে গাছের আবডাল হতে গলায় ধামার হাঁসুলি পরা বেড়াল দেখে কি, তিন্‌টী বাঘের বাচ্চা বাপমায়ের শিকার করে আনা মাংসে উদর পূরণ করে এই আনন্দ ধ্বনি কর্‌ছে। হাঁসুলি-ধারী এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখে তারা ভীত হয়ে পড়ল। ইত্যবসরে চতুর বেড়াল ভুক্তাবশিষ্ট যা ছিল তা সাঙ্গ করে ফেললে। প্রতি-দিনই এই ব্যাপার চলতে লাগল। এদিকে ব্যাঘ্রশিশুদের অনাহারে দিন দিন শুকিয়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত হাত পা নলি নলি আকারের হচ্ছে দেখে ব্যাঘ্রী এক দিন স্বামীকে বল্‌লে—"দেখত বাছাদের দশা"! নিশ্চয়ই কেউ এসে এদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে। খবর নিতে হবে।" তাহারা লুকিয়ে পাহারা দিতে লাগ্‌ল। বিড়ালটি অভ্যাসমত পরদিন যেমন এসে খেতে যাবে আর কি—এমন সময় রাগে অন্ধ ও বধির হয়ে গর্জ্জন আস্ফালন কর্‌তে কর্‌তে বাবা বাঘ তাকে তাড়া করলে। আগে আগে ধামাধারী বিড়াল পশ্চাতে বাঘ ছুটে চ'লছে। দৌড়তে দৌড়তে একটা গাছের কাছে আসবা মাত্র বিড়াল ত চড়ে পড়ল। বোকা বাঘ না ভেবে চিন্তে যেমনি চড়তে গেছে, গাছের ফাঁসায় আটক পড়ে দম ফেটে মরে গেল। বিড়াল গাছ হতে নেমে পা টিপে টিপে চুপিচুপি এসে পরখ করে যখন দেখলে বাঘটা নির্ঘাত মরেছে তখন বাঘিনী আর ছানাগুলি যেখানে পথ চেয়ে পড়েছিল বীরদর্পে সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাঘের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বাঘিনীকে বল্‌লে, "দেখ্ তুই যদি আমায় ভালয় ভালয় নিকে করিস্ ত কর, নয়ত তোর কাচ্চাবাচ্চা শুদ্ধ তোকেও সাবাড় কর্‌ছি।" বাঘ ফির্‌ছে না দেখে বাঘিনী প্রমাদ গণলে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখে কি বাঘ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তখন বেচারা আর কি করে অগত্যা নিকে করলে! তার দিন সুখেই কাটতে লাগল। বিড়াল কিন্তু বুঝলে বিপদ সম্মুখে। ব্যাঘ্রশিশুগুলি বাল্য অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ কর্‌ছে। সৎ-বাপের সঙ্গে তারা যে ভাবে আমোদ প্রমোদ সুরু কর্‌লে তাদের পক্ষে খেলা হলেও এর মৃত্যু তুল্য হয়ে উঠল। এ আর এক কোপে মরা পড়া নয়, তিলে তিলে মরা। ভালবাসার সম্বর্দ্ধনাই মৃত্যুর কারণ হল। এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে বনের মধ্যে বর্ষা এসে দেখা দিল। এ সময়টা আরণ্য জীবের পক্ষে দুঃসময়—শিকার মেলা ভার, খাদ্যের অভাব। গৃহিণীকে বুঝিয়ে পড়িয়ে অন্যত্র যাবার জন্যে রাজী করালে। বল্লে নদীর অন্য পারে আহারাদি সুপ্রতুল। ব্যাঘ্রী সম্মত হয়ে নদীর ধারে এল। সাঁতার দিয়ে ওপারে যাবে। বিড়াল বল্লে, "গিন্নি তুমি এগোও আমি তোমার পিছু পিছু যাব"। সেই পুরাণগানের মত, "ধীরে ধীরে যাও কালাচাঁদ আমি তোমার সঙ্গে যাব"। মা জলে নামছে দেখে ছেলে মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে নামল। জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে শেষে ডুবে ম'ল। বুদ্ধিমান বিড়াল নিরাপদে তীরে দাঁড়িয়ে এই দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখ্‌লে। অতঃপর অবিলম্বে পুনরায় গ্রামে ফিরে গেল। পুরাতন পরিচিত স্থানে দিন সুখেই কাটতে লাগ্‌ল। আত্মরক্ষার্থে গাছে চড়বার সময়ই ইতিপূর্ব্বে ধাক্কা লেগে ধামাটি কণ্ঠচ্যুত হয়ে ভূমিসাৎ হয়েছিল। তা না হলে এমন ব্রাভরণে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালে স্বয়ম্বরায় ব্যাঘাত ঘট্‌ত। গল্পটি বানিয়ে বলে আবার উপসংহারে তার একটি নীতি যোজনা করে দেবো, আমি শিকারী আমার সে কাজ নয়।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানষী ছাড়তে হয়। বুড়ো না হলেও বয়স আমার হয়েছে। সেটা বেকবুল যাবার যো নেই। সারাক্ষণই জাহাজ, জুতো, শীলমোহর, বাঁধাকপি আর রাজরাজড়ার গল্প করা পোষায় না। সেই জন্যে আমার প্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করতেই হয়। চিঠির আরম্ভেই আমার জানিত দুটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলব। সকলেই জান বোধ হয় বরাহ ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত হয় না। বীরের মত হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করতে এমন আর কোন জন্তুকে দেখা যায় না। গুলি খেয়ে বাঘ যদি একদম বেহুঁস হয়ে না পড়ে, তাহলে তোমার বন্দুকের সাড়া পেয়ে সে গর্জ্জে উঠে, ভালুক আঘাত পেলে কাতরে কাতরে কাঁদে, চীৎকার করে। শুধু বরাহবীর বন্দুকের গুলি, বল্লমের খোঁচা সব উপেক্ষা করে খাড়া থাকে,—টলেনা, বলেনা, চলেনা। বরাহ, ব্যাঘ্র, চিত্রক কখন বনে একত্র বাস করে না। এক বনে থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন অংশে গিয়া আস্তানা নেয়। তাই এক চিত্রক যে কেমন করে বরাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! একজন চাষা রাত্রে ক্ষেত্রে পাহারা দেবার সময় এই যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখে। যুদ্ধ ব্যাপার ভোরের দিকেই ঘটে। তার কাছেই আমরা সংবাদ পেলাম। জায়গাটিতে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ যে হয়েছিল, তার নির্ভুল নিদর্শন চারি দিকে দেখতে পেলাম। রক্তের ছড়াছড়ি আর শূকরের ক্ষুরের মত পায়ের গভীর চিহ্ন। আর একটি স্থানে বাঘের পায়ের আঁচড়ের দাগও দেখলাম। রক্তও সেখানে কিছু বেশী জমেছিল। খোঁজ করে তাদের খোঁয়াড়ে পৌঁছিতে আমাদের কিছু সময় লেগেছিল। বাঘটি বেশী দূরে যেতে পারে নি। তার চলা ফেরা হাত পা নাড়া দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল, যুদ্ধে সেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে, অবস্থাও সঙ্কট। আমাদের সোরগোলে যখন বেরিয়ে এল দেখলাম লড়াইয়ে হেরে, পলাতক কুকুরের মত একেবারে কাঁচু মাচু গোলামা চেহারা! সহজেই বন্দুকের মুখে আত্ম সমর্পণ করলে। এঁকে শেষ করে শূয়োরের খোঁজে গেলাম, তাকেও মারলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম, বাঘের গায়ে মারের দাগ বেশী। গলার কাছে আর পাঁজরের চামড়া অনেক খানি ছেঁড়া। মাংসের মধ্যে গভীর ক্ষতও ছিল। দিব্য বলবান শরীর, দৈর্ঘে প্রায় ৭ফুট। শূকরটী কাঁধের কাছে উঁচুতে প্রায় ২৬ ইঞ্চি। সেইখানে দুই একটা সামান্য আঁচড়ের দাগ, আর মাথার উপর দুএকটা এর চেয়ে গভীর ক্ষত চিহ্ন চোখে পড়েছিল। মাটীতে মাথা ঘষে এই ক্ষত গুলিতে সে কাদার প্রলেপ লাগিয়ে নিয়েছিল। চেহারায় মনে হল বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সে কিছুমাত্র কাবু হয় নি। আমরা তার দিকে আসছি বুঝে আড়াল হতে সে এম্নি দ্রুত সম্মুখে এসে পড়ল যে আমার ভয় হয়েছিল বুঝি গুলি ফসকে যাবে। বাঘটাকে মারবার যা কিছু গৌরব সেটা তারই। তবে বিজয় বৈজয়ন্তী বাঘছাল খানি আমারই লভ্য হল।

চরের উপরের জমি ঘাস আর শরবনে ভরা। দেখেই মনে হয় বাঘ থাকবার উপযুক্ত স্থান। দুদিন ধরে আমি ও R বন বাদাড় ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছি তবু যে ব্যাঘ্রদম্পতির আগমন সংবাদ পেয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম তাদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তাঁবুতে ফিরবার পথে একটা মস্ত মরা গরুর উপর হুঁচট খেয়ে পড়লাম। দেখে বোঝা গেল এ হত্যাকাণ্ড বাঘের কীর্ত্তি। আবার সম্ভব জায়গা গুলিতে খোঁজ আরম্ভ হল কিন্তু লাভ কিছুই হল না; বাঘ পূর্ব্বের মতই নিরুদ্দেশ। তখন R বল্লেন মরা গরু যেখানে আছে সেইখানটাতে হত্যা দিয়ে থাকা যাক দেখি কি হয়! চাঁদনি রাত,

মস্ত বড় চাঁদ, চারি দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না! কিন্তু বাঘ যে ছায়ায় ছায়ায় ফিরতে লাগল তাকে আর স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তার চলা ফেরার শব্দ কাণে আসে, কিন্তু তাকে দেখা যায় না। আমরা আরো ভালো সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পিছন হতে এক বরাহ এসে উপস্থিত। বলা কওয়া নেই, এসেই বাঘকে আক্রমণ করলে। "যুদ্ধং দেহি" বলবার সাহস তার আর হল না। লাঙ্গুল সঙ্কোচ করে অবিলম্বে পলায়ন দিলে। এ ব্যাপার ভারি নূতন। শিকার সম্বন্ধে R'এর অভিজ্ঞতা অনেক হলেও, তিনি কিম্বা আমি এমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নি কিম্বা শুনি নি। শূকরটী নির্ব্বিবাদে সেই গাভীর মৃতদেহে মুখ প্রবেশ করিয়ে মনের সুখে আহারে মনোনিবেশ করলে। অনেকক্ষণ ধরে আহার আর শেষই হল না। ইতিমধ্যে বাঘ আবার ফিরে এসে যেই তার ন্যায্য আহারে প্রবৃত্ত হল অমি শূকর আপন মুখের গ্রাস শেষ করে আবার তাকে তেড়ে গেল। সেও দৌড় দিলে, একবার দুবার নয়, চার চার বার এই একই ব্যাপার ঘটল। অত্যন্ত শীত ছিল। আমরাও মিছামিছি বসে বসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করা গেল, দেখাযাক বা না যাক, বাঘটী যেখানে আছে মনে হচ্ছে সেই দিক লক্ষ্য করে গুলি করা হক, তার পর ভাগ্যে যা থাকে। হাতী এগিয়ে আন্‌বার জন্যে আগেই সঙ্কেতসূচক বন্দুকের আওয়াজ করে-ছিলাম। অপেক্ষা করতেই হত তাই মনে হল এ যুক্তি মন্দ নয়।

R আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পায়ে আঘাত লাগল কি ?" আমি বল্লাম, "না, কেন বল দেখি" ? তিনি বল্লেন তাঁর বন্দুকের নলটী ফেটে গেছে। ফিরে দেখি, হাড়-গিলের ঠোঁটের মত বন্দুকের নল ফেটে হাঁ হয়ে রয়েছে! বন্ধু বল্লেন বন্দুকের দোষে এমন হল। আমি বল্লাম ঠিক দোকানে কেন নি, গুলিটা বদ। মীমাংসা আর হল না, তবে দোষ যারি হ'ক যে দোকানে বন্দুক কেনা হয়েছিল তারা নল বদলে আবার এক জোড়া নূতন দিলে।

পরের দিন দেখি কি, গুলি বাঘে না খেয়ে মরা গরুর উদরসাৎ হয়েছে। শূকরটী, মৃত গোমাংসের সঙ্গে তার জঠরস্থিত পত্রপল্লব দূর্ব্বাদল অনেক পরিমাণে আহার করেছে দেখলাম। কি মনে করে, কে জানে? আমিষের পর নিরামিষ ব্যবস্থায় পরিপাকের সম্ভাবনা বুঝি অধিক? শূয়োরে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করে, এ কথা আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে যে ঘাস বিচালীও খায় এ তথ্য নূতন সংগ্রহ হল। বরাহটীর প্রকাণ্ড শরীর, হয়ত বা পূর্ব্ব হতে তাড়িত ব্যাঘ্রের সঙ্গে কোনরূপ মধুর সম্বন্ধ ছিল। নয়ত মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এমন উপহাস করা বড় একটা শোনা যায় না।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ!

পায়ে হেঁটে বাঘ ভালুক শিকার করবার সময় যদি সতর্ক হওয়া আবশ্যক হয় তাহলে চিতা শিকার করবার সময় আরো অধিক সাবধান হওয়া দরকার। একতো এরা বাঘের চেয়ে চতুর; তা ছাড়া গাঁয়ের আনাচে কানাচে কুকুর ছাগল ধরে নেবার ফন্দীতে ফেরে। মানুষের সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে বলে তাকে বড় একটা ভয় করে না। চলা ফেরাতেও চটপটে। খুব শীগ্‌গির পালাতে বেশ পারে। তোমার তাঁবুতে কুকুর যদি থাকে তাহলে চিতা একবার এসে দেখা দেবেই আর সুবিধে করতে পারলে সেটিকে নিয়ে অন্তর্দ্ধান হবে। এই ব্যাপারের সব চেয়ে সুন্দর অভিনয় যে দেখে-

ছিলাম সে হচ্ছে এক সন্ধ্যা বেলাতে। বনের মধ্যে আমি আর মো - দাদা বনপথ দিয়ে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে বাড়ী ফিরছি। এমন সময় ঠিক আমাদের সম্মুখে কিছু দূরে একটি চিতা লাফিয়ে পড়ে দাদার কুকুরটিকে মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেল। এই চিতাটি দেখতে যেমন সুন্দর তার শরীরটিও তেমন বড় ও সুঠাম। বেচারী টেরিয়ার "টুকটুক্" আমাদের আগে আগে চল্‌ছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে ফিরে দেখছে আমরা কত দূরে। অম্নি তার সারমেয় লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল! আর এক বার ঠিক এই ভাবেই মো—দাদা তাঁর আর একটি কুকুর হারিয়েছিলেন। সেবারকারটি হাউণ্ড। সেবারে আমরা ঝিল হতে পাখী শিকার করে ফিরছিলাম, কুকুরটি আগে আগে চলছিল, এমন সময়ে পথের উপরে একটা কালো ছায়া পড়ল। একটা চিতা বনের গা ঘেঁষে ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে হঠাৎ কুকুরটিকে এক কামড় দিয়ে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল! এত দ্রুত ব্যাপারটা হয়ে গেল যে কুকুরের কান্না শুনে যখন আমরা চেয়ে দেখলাম তখন তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। সেদিকে একটা গুলি করবারও অবসর হ'লনা। এর শোধ আমরা তুলব বলে শপথ করলাম। কিন্তু শপথ এক কথা আর সফলতা আর এক কথা। এর পরে সেই প্রদেশেই আমরা গুটিকত চিতা মেরেছিলাম। আর সেই দুই সন্ধ্যার ডাকাত এদের মধ্যেই কেউ হবে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। দেরীতে হলে প্রতিশোধের মাধুর্য্যটা হ্রাস হয়ে যায় এই যা দুঃখ।

দেশী কুকুর হচ্ছে চিতার প্রিয় খাদ্য। কুকুরেরাও সে কথা জানে। কত বার সন্ধ্যার সময় দেখেছি দেশের বাড়ীর প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনার মধ্যে একটু খানি আশ্রয় পাবার জন্যে তারা প্রাণপণে লড়াই করছে। একবার আমার তাঁবু হতে একটা কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বেচারী বেশ আরামে একটা কোণে গুটীসুটি হয়ে শুয়েছিল। পর দিন যখন শুনলাম তাকে এমন করে বার করে দেবার ফলে চিতাএসে রাত্রিতে ধরে নিয়েগেছে তখন ভারি আপশোষ হ'ল। পাহাড়ের জঙ্গলে চিতা শিকার করা বড় মুস্কিল ; এরা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে জঙ্গল পেটালে বেরয় না। শুধু গরু কি ছাগল মেরে খায়, মৃত গরু কি ছাগলের কাছে হত্যা দিয়ে বসে থাকা ছাড়া তার দর্শন পাবার উপায় নাই। আমরা একবার বঙ্গীয় ব্যাঘ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটীকত বড় বড় মোষ এদিকে ওদিকে বেঁধে দিয়েছিলাম। যার ধন সে পেলে না। প্রতি দিনই কিন্তু চিতা এসে এ গুলিকে শিকার করে রেখে যেত। অথচ যখন তাদের নাগাল পাবার জন্য রাত দুপ্রহর ধরে এই সব মরা মোষ পাহারা দিয়ে বসে থাক্‌তাম তখন তাদের টিকিও দেখা যেত না। তার পরে ভোরে শিকারীরা এসে বলত আমরা চলে আসার পর শেষ রাত্রে এসে তারা সে গুলি নিঃশেষ করে গেছে। এ খবর যেন আমাদের কাটা ঘায়ে নুণের ছিটের মত লাগত। এ দিকে বাঘেরাও এদের উপ-বে হতাশ হয়ে আমাদেরও নিরাশ করলে। সংবাদ পেয়েছিলাম সেখানে অন্ততঃ যুগল শার্দ্দুলের আবির্ভাব হয়েছিল।

চাতুরী আর দুষ্ট বুদ্ধিতে পণ্ডিত হলেও চিতা অনেক সময় ভারি ভীরুর মত ব্যবহার করে। ক'দিন ধরে আমরা একটা মস্ত চিতার সন্ধানে ফিরছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নি। এই ক'দিন আগেই সে একছত্রী সম্রাটের মত চারি দিকে গাভী বলীবর্দ্দ আর গোবৎসের যথেচ্ছা নজর আদায় করে ফিরছিল। নিরাশ হয়ে আমরা অন্যত্র যাব মনস্থ করছি এমন সময় এক সুপ্রভাতে শিকারীরা তার পায়ের টাটকা দাগের আনন্দ সংবাদটী নিয়ে এল। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার রাত্রির

"আমি এমনি একটি গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম—"।—(৪১ পৃষ্ঠা)

ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট এক মৃত গোবৎসের সন্নিধানে উপস্থিত হলাম। ভুরি ভোজনের চিহ্ন চারি দিকে দৃষ্ট হল। চিতাটী আয়তনে বৃহৎ হলেও তার শরীর খানি কসরৎ করা পাঠানের মত,—একেবারে বাহুল্য মাংসবসাবর্জ্জিত, কৃশ-মধ্য, সুঠাম, সুন্দর! কদিন ধরে আমার শিকারীদের বনে বনে দৌড় করিয়ে হয়রান করে নিয়ে বেড়াতে লাগল। যখনই ধরি ধরি মনে হয়, তখনই খবর আসে আর এক জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। একবার ত খোলা মাঠের উপর দিয়ে পার হয়ে চলে গেল। সে পথে তার পায়ের দাগ আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। সন্ধান করে নাগাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অনেক দূর পথ ঘুরে ঘুরে তবে কোন চিহ্ন দেখা যায়। বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে শিকারী যখন ফেরে তখন মনে হয় মিছামিছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষটার বুঝি বা মাথার কিছু গোল আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান ও পারদর্শিতা আছে তারাই জানে এ সব আনাগোনা, চলা ফেরা অনর্থক কিছুই নয়। ধাঁধার মত মনে হলেও এই গতিবিধির সার্থকতা আছে। যে সব শিকারীরা এই 'C. I. D.'র কাজ করে তারা জানে, কোথায় পায়ের দাগের জন্য খোঁজ করতে হয়। ছেঁড়াপাতা, ছড়ান ঘাস, আর নেতিয়ে পড়া লতার অর্থ কি? আমরা ভোরে এই চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। বেলা দুটো পর্য্যন্ত সঠিক খবর পাওয়া যায় নি। তার পর কতগুলি মরাপাতার নড়াচড়া, ছোট একটী ধরাশায়ী কচিগাছ, তারই পাশে বনের গলির মুখে ব্যাঘ্রপদাঙ্কের ভগ্নাংশ তার সন্ধান আমাদের বলে দিলে।

ঘাস জঙ্গল ছাড়া এ সব জন্তু সহজে পথ করে সোজা যেতে পারে না। কিন্তু যে পথে বাধা অল্প সেই দিকে আপনা হতে গলি পথ গড়ে ওঠে। এরা এই আঁকা বাঁকা গোলক ধাঁধার মত পথে লুকিয়ে লুকিয়ে আসা যাওয়া করে। কেবল যখন আঘাত পেয়ে ব্যথায় জ্ঞানশূন্য হয় তখনই হঠাৎ খোলা জায়গায় এসে পড়তে দেখা যায়। এ সব পথ আবার আবিষ্কার করা সহজ নয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বর্ষায় গাছ কিম্বা জমি খসে পড়ার জন্যে অনেক সময় এরা পুরাণ পথ ছেড়ে নূতন পথে যাতায়াত আরম্ভ করে।

যা হউক এখন আমার গল্পটা আবার সুরু করি। শিকারীরা ঝোপটার চারি দিক বেশ মনোযোগের সহিত দেখে বুঝলে বেরিয়ে আসবার পথ সব গুলিই ভাল। তাড়া পেলে কোন্ পথে আসবে সেটা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। সেই বুঝে তারা তাড়া দেবে ঠিক করলে। আর সকলেই আপন আপন জায়গা পছন্দ করে নিয়ে সেই খানে নিঃশব্দে পাহারায় দাঁড়াল। আমরা দুক্রোশ পথ ঘুরে ঘুরে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছেছিলাম। তাই যাতে কোনরূপ নিরাশার কারণ না ঘটে সে দিকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। চারি দিকে কাছাকাছি গুটিকত বড় বড় গাছ। কাঁটায় ভরা ঘন বেতসলতা কুঞ্জের কোন অভাব ছিল না। আমি এমনি একটী গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান হতে পালাবার পথে সব গুলি গলির মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাড়না সুরু করতে না করতে চিত্রক বাহিরে এল; এসে আমার মানুষ গন্ধ পেলে, না আমার বন্দুকের নলটা দেখতে পেলে ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু একেবারে বাইরে না এসে গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আমি যেখানে ছিলাম সেখান হতে তার ঠোঁটের একটু খানি, গোঁপের ওঠানামা, আর লাঙ্গুলের ঘন রোমাবলী দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র সে এই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আড়াল হতে বাইরে আসবা মাত্র তাকে মারব বলে আমিও একাগ্র মনে প্রতীক্ষা করে রইলাম। বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও পাশ কাটিয়ে কোণাকুণি নাগাল পাবার জন্য তার দিকে দৌড় দিলাম। যদিও খুব কাছে গিয়েছিলাম, বস্তুতঃ একটু বেশী রকম

কাছেই পৌঁছিলাম, তবু আমার গুলি তার গায়ে না লেগে উপর দিয়ে চলে গেল। পালাবার সময় হঠাৎ সে একবার মাটীতে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। এতই কাছে ছিল যে বন্দুকের নল দিয়ে তাকে আমি ছুঁতে পারতাম। পালাতে পালাতে অকস্মাৎ সে যে কেমন করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমাকে আক্রমণ না করে, তার বংশগত ক্ষিপ্রতার সাহায্যে পিছিয়ে সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে পড়ে, অন্ততঃ সেবারের মত অদৃশ্য হয়ে গেল! এ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার শিকারীদের মধ্যে সব চেয়ে যে মজবুত, বিপিন, মস্ত এক বল্লম হাতে করে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ত আমার দুঃসাহস দেখে ভীত হয়ে উঠল, কিন্তু তাই বলে ফেলে পালায় নি। সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাঘ যে পথে গিয়েছিল সে পথে আমায় নিয়ে চলল। বনের অলি গলি তার খুব পরিচিত। আমি আবার কিছুই জানতাম না। অন্য শিকারীদের ডাক দিয়ে আনবার জন্য যেই সে একটু দূরে গেছে অমনি আমি বুঝতে পারলাম বেতঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ে উঠল। তার পর বাঘের ঘাড়ের কতক অংশ দেখে বুঝলাম সে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে ফুট কয়েক আসবা মাত্রই গুলি করবার জন্য বন্দুক উঠালাম। এতেই ঈষৎ যে শব্দ হয়েছিল তাতে সে সতর্ক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। সেই সুযোগে আমি তার গলায় গুলি করলাম। সেইখানেই সে ইহ লীলা সম্বরণ করলে।

এই বাঘটী যুদ্ধ কিম্বা সাহসের কোন পরিচয় দেয় নাই, বরং তার ভয়ত্রস্ত সঙ্কুচিত ব্যবহার দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম। গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যে তার ছিল না, তাও নয়। আহারের চেষ্টায় অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। আমি যে ভাবে তার পিছু ধরে ছিলাম তাতে আমার স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই বন হতে তার পালাবার কোন উপায় ছিল না। আবার একবার শিকারীদের একত্র করে অনুসন্ধানে বার হলেই ঠিক হত। কিন্তু প্রতীক্ষা করে আমি ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর জানইত "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষ্মী"। লক্ষ্মী নয়, ব্যাঘ্র পেলেই সে দিনের মত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কাজেই আর চুপচাপ বসে থাকতে পারি নি। জীবনেই বল আর শিকারেই বল যে শুধু নন্দলালের মত "বাঁচিয়া রহিল কোন মতে", তার ভাগ্যে কিছুই লাভ ঘটে না।

এ বাঘটী তাড়া খেয়েও যেমন টুঁ শব্দ করে নি তেমনি আর একটী বাঘ অকারণে আশী হাত দূর হতে আমায় তাড়া করে এসেছিল। আমি তার চলা ফিরার পথে কোন বাধা দিই নি। তাকে আমি আক্রমণ করতে পারি এমন ভাবও ব্যক্ত করি নি। তবু সে গায়ে পড়ে, যেন "রাস্তা নিকিয়ে," আমার সঙ্গে কোন্দল বাধিয়ে ছিল। সে ইতিপূর্ব্বে নদীর ধারে খড়ের বনে যেখানে লুকিয়ে ছিল তার মাথার উপর ছাড়া চারি দিকে ঘন বেতবনে ঘেরা। শিকারীরা আবার যখন নূতন করে বন পিটিয়ে তাকে বার করবার চেষ্টায় ছিল, তখন সে ঘাসের বন যেখানে হাল্কা হয়ে আসছে সেই খানে আত্ম-গোপন প্রয়াসে, বোকার মত প্রথম আপন মাথা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, মনে করেছিল আর কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বিপুল শরীরখানি যে দেখা যাচ্ছে একবারও ভাবে নি। স্থির হয়ে দাঁড়ান তার ভাগ্যে লেখে নি। শিকারীদের তাড়ায় তাকে এগিয়ে চলতেই হল। আবার সেই কাদায় ভরা নদী পার হয়ে বনের পথে দেখা দিলে। নীচেই আর একটী বন ছিল। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম

বল্লম হস্তে মজবুত শিকারী বিপিন।—(৪২ পৃষ্ঠা)

যে উপর নীচে দুই বনই নজরে থাকে। নদীপার হতে জায়গাটী কিছু দূরে। এর সম্মুখে খোলা মাঠ খানিকটা ছিল, কিন্তু সেখানে দাঁড়ালে আমাকে ক্ষেত পাহারা দেবার খড়ের মানুষের মত দেখাত। সে মূর্ত্তি শোভনও নয় নিরাপদও নয়। তাই আর অন্য আড়াল না পেয়ে আমি একটী বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন শিকারী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঝোপের মধ্যে এক চাব্‌লা মাটী ছুঁড়ে মেরে বাঘটাকে বের কর্‌লে, তা আমি দেখতে পেলাম। অল্প ক্ষণের জন্য সে এসে পাড়ের উপর দাঁড়াল, পিছনে তার বেতবনের ঘন সবুজ পর্দ্দা, থেকে থেকে দুল্‌ছে। এ ভাবে মুহূর্ত্তের জন্যে ছবির মত স্থির হয়ে যখন সে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। শিকারীরা যে দিক হতে তাড়া করে নিয়ে আস্‌ছে সে দিকে গুলি করা নিরাপদ নয়। তাই সেদিক্‌কার গতিবিধি বন্ধ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় সে আমাকে দেখতে পেলে। আর যাবে কোথায়, হুঙ্কার ছেড়ে লাফাতে লাফাতে আমার দিকে আস্‌তে লাগল। এমন ঘটনা আমার শিকারী-জীবনে বড় বেশী ঘটে নি, কিন্তু যখনই ঘটেছে তখনই আততায়ী জন্তুটির ও আমার মাঝখানের সব রকম বাধা ব্যবধান সম্পূর্ণরূপ দূর না হ'লে আমি কখনও বন্দুক ছুঁড়ি নি। বাঘ ভাল্লুক কিম্বা চিতা যখন তোমায় এমন ভাবে তাড়া করে আসে, তখন তুমি যদি উঁচুতে না থাক তা হলে লক্ষ্য ঠিক রাখা বড় কঠিন। সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী সমূহ বিপদ নিশ্চিত জেনে লক্ষ্য যতই স্থির, মুষ্টি যেমনই দৃঢ় হউক না কেন, হাত এক আধটু কেঁপে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমি তখনও বন্দুক ছুড়ি নাই, গুলি সম্বরণ করেই আছি। আর এক লাফ দিলেই সে আমার বন্দুকের নলের উপর এসে পড়ে। এমন সময় হঠাৎ ডান দিকে বেঁকে কিছু দূর গিয়ে গর্জ্জে উঠে আমার দিকে মুখ ক'রে খেঁকাতে লাগল। সেই সময় আমি গুলি কর্‌লাম, কিন্তু সম্মুখের একটা বাঁশে লেগে সে গুলি পাশ কাটিয়ে গেল। আর এক গুলি ছুড়বার আগেই ব্যাঘ্রবীর সত্বর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করলেন। তবে কি আমাকে শুধু ভয় দেখাবার মতলবে ছুটে এসেছিল, না আমায় খাতির নদারৎ দেখে নিজেই ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল?

লোকে বলে বাঘের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে সে ভয় পায়, আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি না। তুমি বহু চেষ্টায় চোখের দৃষ্টিতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় কর্‌বে, বাঘ কিম্বা চিতার চোখে স্বভাবতঃই তার চেয়ে অধিক শক্তি আছে। মানুষের চাহনীতে চমকে যাবে সে প্রকৃতির জন্তু তারা নয়। কিছুই যেন হয় নি এমনতর উদাসীন ভাবের অভিনয় কর্‌বার জন্যে বহু শিক্ষা ও কালের অভ্যাস আবশ্যক। পাশ দিয়ে বাঘ চলে গেল অথচ তোমার শরীরের কোথাও একটু কাঁপল না, বীরাসনে অটল হয়ে রৈলে, এটি মৃগয়াক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত হয় না। আমি দেখেছি ফল যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে সে এমনতর নির্ভীকতার জোরেই হয়। কতবার এই অবস্থায় বাঘ আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে আমি চঞ্চল হই নি, শত্রুতাচরণের জন্যে কোন ব্যগ্রতা দেখাই নি, শেষে সময় বুঝে ধীরে সুস্থে আপন মতলব হাসিল করে নিয়েছি। বাঘের সম্মুখ দিয়ে অকস্মাৎ অন্য দিকে চ'লে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে সবই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; কেননা বাঘও অনেক সময় এমন চট্‌ করে তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ায় যে গুলি কর্‌বার সুযোগই পাওয়া যায় না। আমি যে স্থির ধীর হয়ে বসে থাক্‌বার বিধান দিয়েছি সেইটাই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। এতে তার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। আর তুমি যদি কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে গুলি কর তাহলে প্রায়ই নিরাশ হবার কারণ ঘটে না। যেখানে সহসা বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সম্ভাবনা

সেইটাই সব চেয়ে সঙ্কট স্থান। এ অবস্থার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ যদি হিংস্র জন্তুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তোমার সাহসে না কুলায় তা হলে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এমন সঙ্কট স্থলে ও সময়ে বাঘ দুই কাজ করতে পারে,—হয় পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, নয়ত অনধিকার প্রবেশের জন্য তোমায় শাস্তি দিতে ছুটে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। দৌড়ে যদি না দাঁড়ায় তাহলে অধিকাংশ সময় তোমায় বন্দুক তুলতে দেখেই থমকে দাঁড়ায়। আর সে এই অব্যবস্থিত অবস্থায় থাকতে থাকতেই তার উপর গুলি করা উচিত। এ রকম মুখোমুখি বোঝা পড়া করার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, বুকে গুলি লাগলেও সেটা সব সময় মারাত্মক হয় না। আর যে অাতে ঘা দিলে সে নির্ঘাত মরে, পেট ফুঁড়ে সে গুলি মারা বড় সহজ কথা নয়। অনেকটা অবশ্য, দৈব, ভাগ্য বা ভগবৎ-কৃপা যাই বল, তার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় গুলি তোমার কপাল ঘেঁষে গেল তোমার কিছুই হলনা, কিন্তু তোমার পিছনের লোকটি মারা পড়ল। দুর্ঘটনার হাত এড়িয়ে, কোন বিপদে না পড়ে যদি গোটা ত্রিশেক বাঘ শিকার কর, তা হলে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পার। এ সব অবস্থায় অপরের কাছ হতে কোন সাহায্যের ভরসা রেখ না; সর্ব্বদাই নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরো।

বাঘ আক্রমণ করতে এসে কত সামান্য কারণে পশ্চাৎপদ হয় সে কথা শুনলে আশ্চর্য্য হবে। একবার আমি ও মো—— দাদা একত্রে একই বাঘের উপরে গুলি করেছিলাম। সেটা গড়িয়ে আমাদের বাঁ দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করলে। প্রত্যক্ষ সাক্ষীও অনেক সময় অভ্রান্ত হয় না। এখানেও তাই [illegible]ছিল। আমরা মনে করেছিলাম সে বুঝি মারা পড়েছে, কিন্তু তা নয়। আমাদের গুলি তার সম্মুখের জমি চষে গিয়েছিল, তার শরীরে কোথাও আঘাত লাগে নি। শুধু বারুদের ধোঁয়া আর বন্দুকের শব্দে অন্ধ ও বধির হয়ে সে এমন অদ্ভুত আচরণ করেছিল। সব রকম ঘটনার ব্যবস্থা আগে হতে স্থির করা যায় না। কিন্তু চিতাবাঘ যখন খুব কাছে এসে পড়ে তখন তাকে অবসর না দিয়ে নিজেই আক্রমণ করা ভাল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে গুলি করলে অনেক সময় তার আক্রমণের হাত এড়ান সহজ হয়। বাঘ যখন আক্রমণ করে তখন সম্মুখের কোনরূপ ব্যবধান তাঁর মনোমত হয় না। তাই তোমার আর তার মধ্যে যদি কোন গাছ কি মৃত্তিকা স্তূপের বাধা থাকে, তা হলে কাছে হলেও তাকে দূরবর্ত্তী মনে করতে পার। স্থান নির্ব্বাচনের উপর তোমার কৃতকার্য্যতা অনেকটা নির্ভর করে। তার অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। তিন বৎসরের মধ্যে আমি আঠারটা চিতা শিকার করেছিলাম, আর এই সময়ের মধ্যে আমি বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছি পনেরটি আমাকে একেবারে দেখতেই পায় নি। নিজে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করার সম্বন্ধে আমি তোমায় একটা উদাহরণ দেখাব। ব্যাপারটা আমাদের দেশের বাড়ীর কাছেই ঘটেছিল। একটা ঝোপের দুধার দিয়ে দুটি রাস্তা গিয়েছে। আক্রমণ করতে হলে চিতা এরই কোন একটা ধরতে পারত। আমি একটা বাঁশঝাড়ের কাছে মুখ লুকিয়ে বসেছিলাম। কোন অঘটন হতে পারে এমন সংশয়ের লেশমাত্র মনে উদয় হয় নি। আমি যেখানে বসেছিলাম তার কিছু নীচে একটা গভীর পুষ্করিণী। তারই ধারে আর একটা রাস্তাও ছিল। তার পাড় খাড়া উঁচু। সেখানে পা রাখবার একটু জায়গা ছিল না। আর পা ফস্কালেই জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার শিকারীরা ও আমি এই রাস্তাটাকে গণ্য করা আবশ্যক মনে করি নি। আর তাদের গম্ভীর পরামর্শ
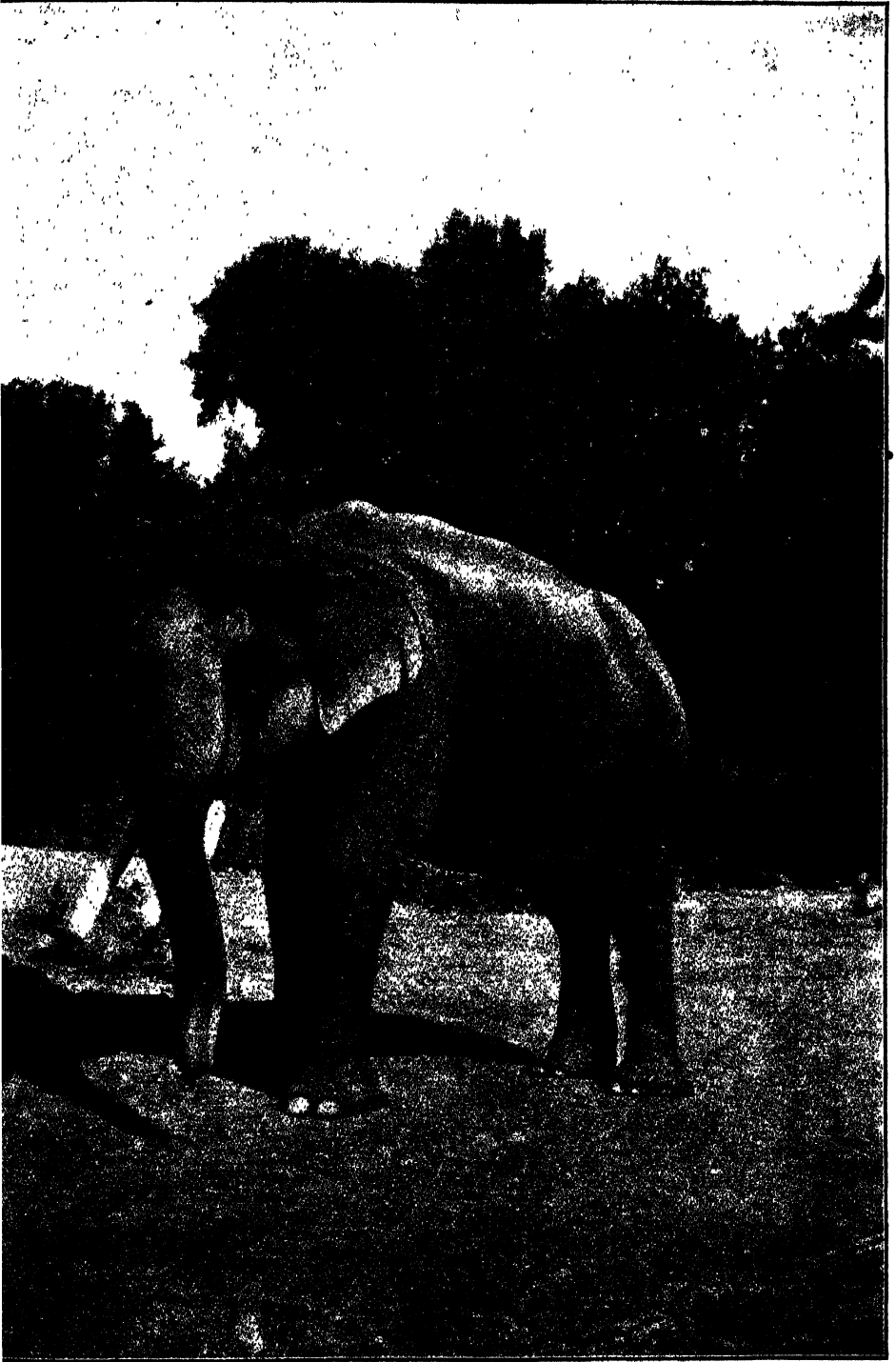
"আমি যতগুলি দাঁতাল হাতী দেখেছি তার মধ্যে মোহনলালের মেজাজ ভাল।"—(৪৫ পৃষ্ঠা)

অনুসারে আমি টুলটী একেবারে ধারে নিয়ে পেতেছিলাম। নুয়ে পড়া বাঁশের উপর বন্দুকটী রেখে তাক্ করবার সুবিধা হবে বলে বাঘটাকে ঘেরাও করে আনবার সঙ্কেত দেওয়া হ'ল। "মোহনলাল" মাতঙ্গ বেতবন পায়ে দলিয়ে পুকুরের ধারে ধারে এগোতে লাগল। শিকারীরাও তার অনুসরণ করলে। জমিটা নীচু ছিল। বেশী নিরাপদ নয় বলে শিকারীরা সম্মুখে এল না। আমি সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে কোথায় কি শব্দ হয় কি নড়ে দেখবার শোনবার জন্য সতর্ক হয়েছিলাম। এমন সময় আমার কিছু নীচে কি যেন একটা ঈষৎ নড়ে উঠল মনে হল। ফিরে দেখি পাড়ের দেয়াল বেয়ে একটা মস্ত চিতা আমার গজ খানেক নীচে হতে উঠে আসছে। আমি বন্দুক ঘুরিয়ে নিতেই সে আমায় দেখতে পেয়ে পালাল। ঢালু পাড়ের আড়াল থাকায় তাকে তখন আর দেখতে পেলাম না। যত নিঃশব্দে পারি আকার ইঙ্গিতে ব্যাপারটা মাহুতকে বুঝিয়ে দিলাম। তারা চারি দিক হতে বাঘটাকে কাছে ঘিরে ধরল। আমিও টুল ফিরিয়ে বন্দুকটা এমন ভাবে ধরে রইলাম যে উপরে নীচে যে দিকে দরকার সে দিকেই গুলি করতে পারি। বন্দুকের কুঁদো এমন নীচে রেখেছিলাম যে ঘোড়াজোড়া আমার হাঁটুর উপরে ছিল। বাঘটা আমায় আগেই দেখেছিল, তাই মনে করেছিলাম আমি যেখানে আছি সে পথে আর আসবে না। তবুও আমি সব আট ঘাট বেঁধে ঠিক হয়েছিলাম। যতক্ষণ সম্ভব সে গা ঢাকা দিয়ে রইল। তার পর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখি যে এক রাশ কটাসে হলদে লোমের গাদা সম্মুখে এসে পড়েছে। বাঘের মাথাটা প্রায় বন্দুকের কুঁদোয় এসে ঠেকেছে। তখন তাকে আক্রমণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বন্দুকের কুঁদোর চোটের চেয়ে আমার "যুদ্ধং দেহি" ভাবে সে বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে গুলিটী খেয়ে ব্যাঘ্রাসুর ঝপাৎ করে জলে পড়ে গেল। আমি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। এই খানেই বাঘের ব্যবহার আর স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার হিসাবের বাহাদুরী। একজনকে বাড়িয়ে অপরজনকে খাট করে তুলনা দিয়ে কথা বলাটা ভদ্রতা নয়, তবু শার্দ্দুল দম্পতি সম্বন্ধে বলা চলে যে মহিলাটী এগিয়ে এসে লড়াই বাধাতে মজবুত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অভিজ্ঞতা এইরূপই বলে। ইনি শিকারীও খুব হুঁসিয়ার। যে আগুন বাঘিনীর চোখে জ্বলে তা দ্বিগুণ ও নির্ম্মমতর।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ!—

মোহনলালের কথা বলতে গিয়ে তার সম্বন্ধে বেশ একটী গল্প মনে পড়ে গেল। তাতে তার বুদ্ধির বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়। আমি যতগুলি দাঁতাল হাতী দেখেছি তার মধ্যে মোহনলালের মেজাজ ভাল। শিকারক্ষেত্রে সে বেশ সতর্ক। সারা দিনের শেষে যখন আমরা মৃগয়ায় জয়ী হয়ে বাড়ী ফিরতাম তখন গজেন্দ্রি ধরণে তার পারিতোষিক মিষ্টান্ন ও ইক্ষুদণ্ডের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে কখন ভুলত না। তাকে আদর করতে গেলে সে ঘড়ায় জল ভরবার মত শব্দ করে মনের আনন্দ প্রকাশ করত, তার পর চলে আসবার সময় কোটের খুঁট ধরে টান দিয়ে জানাত শুধু সোহাগে পেট ভরে না, মিষ্টান্ন আবশ্যক।

ঘন বেতবন, দুই ধার ঢালু হয়ে নালায় নেমেছে। যারা জঙ্গল পিটিয়ে এগিয়ে আসছিল তাদের পক্ষে এই পথে চলা শুধু দুরূহ নয়, বিপজ্জনক—বিশেষতঃ নালার ধারে। "কুনকী" (হস্তিনী) এক

নালা দিয়ে, আর মোহনলাল অন্যটাতে "বীরপদ্ম ভরে কাঁপায়ে মেদিনী" অগ্রসর হচ্ছিল। আর জঙ্গল পিটোবার ভার যাদের উপর ছিল তারা এই দুইএর মধ্য দিয়ে উঁচু জমি দিয়ে চলেছিল। দুই নালার মোহনায় আমার বসবার জায়গা। সেখান হ'তে দুই হাতীর এগিয়ে আসাই দেখতে পাচ্ছিলাম। মোহন সাবধান সতর্ক, মাঝে মাঝে শুঁড় বাড়িয়ে দূরে আঙ্গরাখা পরিধানী জীবটীর খোঁজ নিচ্ছিল। সে লাথি মেরে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটী চারি দিকে ছড়িয়ে ফেলছিল। তাতে কিন্তু বাঘটী কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। মোহনলালের এই "খবরদার" সে যে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেছিল তার আভাস টুকুও পাওয়া গেল না। যে ভাবে মোহনলাল তার থামের মত পা তুলে আবার ফেলছিল, সেটা দর্শনীয় ব্যাপার বটে। তবুও দেরী হচ্ছে বলে আমি অধীর হয়ে পড়ছিলাম। এমন সময় মোহন পাশের গাছ হতে একটা ডাল ভেঙ্গে নিল। আমি ভাবলাম "ওরে লোভী !" কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে ক্ষুধা নিবারণ কিম্বা রসনার পরিতৃপ্তির জন্য এ কাজ সে করে নাই। শুঁড়ে করে ডালটা ধরে ঘুরিয়ে এনে সে এমনই জোরে ঝোপটার উপরে মারলে যে চিতাবাঘ আচমকা হুড় মুড় করে ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল !

আমাদের প্রতিবেশীর একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতী ছিল। (মফঃস্বলে যাঁরা আমাদের ৮।১০ ক্রোশের মধ্যে বাস করেন তাঁদের আমরা প্রতিবেশী বলে থাকি)। এই হস্তীপ্রবর ভাল শিকারী না হলেও আশ্চর্য্য দাঙ্গাবাজ ছিল। ধানকাটা, জমির সীমানা সাব্যস্ত নিয়ে যখনই লড়াই বাধত তখনই আমাদের এই প্রতিবেশী জমিদার লড়াই ফতে করে ফিরতেন। বিপক্ষে লাঠিয়াল যেমনই চতুর হ'ক না কেন "কালীগজ" যখন শুঁড়ে করে প্রকাণ্ড এক খানা বাঁশ ঘোরাতে ঘোরাতে "বুদ্ধং দেহি" বলে অগ্রসর হ'ত, তখন আর সকলে রণে ভঙ্গ না দিয়ে পারত না। যে হতভাগ্য কালীগজের এই বাঁশের, বাঁশী নয় গদার, প্রকোপে পড়ে যেত তার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকত না। এই বিখ্যাত কালীগজ আজ ইহলোকে নেই! অন্যথা উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করাই ছিল তার জীবনের নিয়ম। আর তার এই নিশাচর অভ্যাসদোষের জন্য মনিবকে অনেক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। ইক্ষুদণ্ডের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। সে একবার শ্রীযুক্ত—মহাশয়কে এমনই ভয় দেখিয়েছিল যে সে গল্পটা তোমাদের শোনা উচিত। তখন বড়দিনের সময়। শেষরাত্রের দিকে বন্ধুর আর্ত্ত চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমটা আমি মনে করেছিলাম ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে হাতীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে বোঝা গেল যে কেমন করে তারা ছুটে গেছে। পাঁচটী হাতী নিরঙ্কুশ অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছিল; এদের মধ্যে পরিচিত ইক্ষুপ্রিয় কালীগজও ছিল। তাকে এ ভাবে বেরিয়ে পড়তে দেখে আর সকলেও তার পদানুসরণ করেছিল। জজের পরচুলা যে মাথায় থাকে সে ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যেতে পারে না। শ্রীযুক্ত—মহাশয় অন্ততঃ তাই মনে করতেন। আসন্ন বিপদ হতে আপনার মস্তকটিকে, সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টের পতন, রক্ষা করবার জন্যে তিনি এ ভাবে চীৎকার করেছিলেন। ক্রমে হাতীদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও আকুলতার বিরাম হ'ল। পর দিন সকালে প্রগাঢ় নিদ্রার জন্যে আমায় অনেক উপহাস সহ্য করতে হ'ল। কিন্তু বিপদের কোন সম্ভাবনাই যখন কোথাও দেখা যায় নি তখন শীতের রাতে লেপের সোহাগ ফেলে কে উঠতে চায় বল ?

যে ব্যক্তি হাতী ভাল বাসে না, সে হয় স্বর্গচ্যুত, নয়ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। আমার হস্তী-প্রীতি

এমনই অসীম যে আমি যদি অবাধে তাদের প্রসঙ্গে কথা কইতে পেতাম তা হলে কথা আমার ফুরত না। আত্মরক্ষায় কিম্বা পাগলা হাতী না হলে, আমি কখনও গজহত্যা পাপে লিপ্ত হব না, নিশ্চয়। সেই জন্যে আমার এ ভালবাসা গোপনে পোষণ করা ভাল, আর মাঝে মাঝে সস্নেহে তাদের কথা উত্থাপন করে অন্তরের সঙ্গোপন অনুরাগ-শিখাটিকে উদ্দীপ্ত করাও চল্‌বে। বহু দিন পূর্ব্বে কটক জিলায় শিকারক্ষেত্রে একটি যে ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়। আমরা ছিলাম তিন জন। আর যাকে পাহাড়ে বলে হাতীপথ, বসন্তের এক প্রভাতে চৈত্র মাসে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। যারা বন পিটিয়ে শিকার করে তারা আগেই যাত্রা করে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে পৌঁছেছিল। আমরা দুচার জন অনুচর সঙ্গে করে আমাদের বন্দুক ছুঁড়বার উপযুক্ত জায়গাগুলির দিকে চলেছিলাম। এখানে সেখানে একটা বাঘের পায়ের দাগ চোখে পড়ছিল। আর এক দল হাতী যে সেই পথে পাহাড়ের দিকে গেছে, তাও স্পষ্ট বুঝা গেল। ছোট বড় পায়ের দাগ অনেক, তার উপর এখানে একটা ভাঙা বাঁশ, ওখানে একটা মচকান গাছের ডাল তাদের গতিবিধি বেশ ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দূরে নীচের উপত্যকায় বাঁশের নিবিড় ঘন বনের মধ্যে তাদের দেখ্‌তে পেলাম। তারা যে অনেকগুলি, কলরবেই তার আভাস পাওয়া গেল। তাদের উপস্থিতি বাঘটিকে বনের অন্তরাল হতে তাড়িয়ে বাহিরে আনবার অন্তরায় ঘটাবে কি না আমাদের মধ্যে তখন সেই তর্ক উঠল।

Bison ছাড়া আর কোন বন্য জন্তু হস্তিদলের সঙ্গে মেশে না। এই বিপুলায়তন জীবগুলির চলা ফেরা আনাগোনা দেখে আর সব জানোয়ার ভড়্‌কে যায়। গুলির আওয়াজ কর্‌লে তারা ছড়িয়ে পড়তে পারে; তাই স্থির হল গুলিই করা হউক। গুলি কর্‌বার কিছু আগেই আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দ হয়ে সমস্ত পাহাড়টি নড়ে উঠল,—গাছপালা থর থর করে কাঁপতে লাগল, পাহাড়ের ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আরম্ভ হল। অসময়ে সহসা যেন প্রলয়কাল এসে উপস্থিত হল! মস্ত মস্ত পাথর, পাহাড়ের ভগ্নাংশ, চারি দিক হতে গড়িয়ে আস্‌তে লাগল। ভীত বানরের দল ও হরিণের পাল যে যেখানে দিয়ে পারে দৌড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নাম্‌তে লাগল। পাখী আর পতঙ্গেরা কাতর বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে, চারি দিকের কলরব আরও বাড়িয়ে তুল্‌লে। ইতিমধ্যে নীচের উপত্যকায় হস্তিসঙ্ঘ শুণ্ড আস্ফালন করে হুঙ্কার করতে করতে একযোগে পলায়নের উদ্যোগ করলে। প্রত্যেক অরণ্যবাসীই কেমন করে বন ছেড়ে খোলা মাঠে গিয়ে পৌঁছিতে পারে, সেই চেষ্টায় উদ্যোগী হল। মিনিট কিম্বা তার চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই এ ব্যাপার ঘটল। সময়ের পরিমাণ আমার স্মরণ নেই, তবে সময় যতটুকুই হ'কনা অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, নিঃসন্দেহ। কি অদ্ভুত দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! জীবনে আর কখনও এরূপ ঘট্‌বে কি না সন্দেহ। আমরা ধীরে ধীরে শিবিরে ফিরে এলাম। প্রকৃতির দুর্ব্বোধ্য নির্দ্দয় খামখেয়ালিতে আমাদের সেদিনকার শিকারের আশা একেবারে মাটি হয়ে গেল।

গল্প আবার সুরু করা যাক্। বাঘ যদি একবার শিকার ব্যাপারের পরিচয় পেয়ে থাকে তা'হলে ভারি চতুর হয়ে ওঠে। আমি অনেকবার দেখেছি, আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল যারা পিটোয় তাদের হাত এড়াবার জন্যে, বাঘ অন্তরালবিহীন বিরল বনে গিয়ে লুকোয়, আর সন্দেহজনক কোনরূপ শব্দ শুন্‌বামাত্র সেখান হতে পলায়ন করে। যদি তাদের লুকাবার জায়গাটা তুমি কোনরূপে বুঝতে

পার, তা'হলে বন পিটিবার সঙ্কেত শব্দ শুন্‌বামাত্র তারা দ্বিগুণ বেগে পলায়ন করে। যেখানে জন্তুটিকে মারে সেখান হতে অনেক দূরে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় নেয়। আর এই উপায়ে অনুসন্ধান-কর্ত্তাদের চোখে ধূলো দিয়ে চলে যায়।

বাঘটা মস্ত বড় ছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম "De Wet"। আমাদের গ্রামেই হত্যাকাণ্ড সুরু করে,—বলতে গেলে আমাদের নাকের উপরে এ দুরূহ কাজ করে', আমাদের সে অমান্য করেছিল। সারা দিন ধরে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত আস্তানা খুঁজেও তার কোন কিনারা করা গেল না। যদিও প্রতিবারেই মনে হচ্ছিল শেষের চেয়ে এবারের জায়গাটি বেশী আশাজনক তবুও প্রতিবারই নিরাশ হতে হয়েছিল। এমন দিন যেত না, যে দিনে সে হয় আমাদের কাছাকাছি, নয়ত মাইল কত দূরে কোন একটা খুন খারাপি না করত। আমাদের অনেক সুযোগ বয়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে সে যেমন কদিন ধরে আমাদের হয়রান করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, 'যেন তেন প্রকারেণ' তাকে পাকড়াও করতেই হবে। আমরা চলে আসবার দিনে আমি তার নাগাল পেলাম। গাঁয়েরই একটা জঙ্গলে সে ধরা পড়ল। রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে ভোরে যখন মাঠে যাচ্ছিল তখন তার গর্জ্জন শুনতে পেয়েছিল। স্বতন্ত্র একটা গ্রামে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে খোলা মাঠের উপর দিয়ে আধ ক্রোশ একটা চর পেরিয়ে শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে সে এসে গ্রামের বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। অধিকৃত বনটির অখণ্ড রাজত্ব একলাই ভোগ করবে বলে বুনো শূয়রদের তাড়াবার জন্যে সে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করেছিল। তাই শুনে নিরীহ ধেনুগোষ্ঠী ভয়ে পলায়ন করে। বোবার বালাই নেই, এই উপদেশ মেনে সে যদি মুখ বুজে থাক্‌ত, তাহলে আর আমরা তার সন্ধান পেতাম না। যে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এসেছিল সেটি একেবারে শুক্‌নো খট্‌খটে। কোথাও এতটুকু পায়ের দাগ পড়ে নি। তাকে খুঁজে বের করারও উপায় হত না। প্রশস্ত ঝিলের ধারে জঙ্গলে সে আশ্রয় নিয়েছিল। সে জায়গাটি একটু উঁচু। উত্তরে দক্ষিণে ঘন বেতবন। ঝিলের ধারে চওড়া একটি ঘাট। সেখানে গরুরা জল খেত। এইখানেই তার পায়ের দাগ আমরা দেখতে পাই। বেতের কতকগুলি লতা একেবারে জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। সে তাই শুক্‌নো ডাঙ্গা ছেড়ে জলের ধারে ধারেই বনে প্রবেশ করেছিল। আমি একটা তেঁতুল গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। জায়গাটি চারি দিকেই খোলা। তাই তেমন নিরাপদ ছিল না। এর চেয়ে ভালো জায়গাও আর ছিল না। তাই তেঁতুলগাছের গুঁড়ির সম্মুখে একটা পাতায় ভরা ডাল রেখে একটু আড়াল করে নিলাম। শুধু বন্দুকের নিশানা আর আমার দৃষ্টির বাধাজনক পাতা ও ছোট ছোট ডালগুলি ভেঙ্গে ফেললাম। দুটি হাতী ঝিলের ধারে ধারে এগোচ্ছিল। আর বন যারা পিটোয় তারা পূর্ব্ব পশ্চিমে চলেছিল। হাতীর ভীষণ হুঙ্কারে আমরা সব প্রথমে তার সান্নিধ্য বুঝতে পারলাম। কিন্তু খোলা গোচারণের মাঠে এসে দাঁড়াতে তার আরও কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। অন্দর হতে সদরে আসবার জন্য তার কোন তাড়া ছিল না। এধার হতে ওধারে যাবার জন্য কোন ঔৎসুক্য বোঝা যায় নি। সে আসলে যত খানি উঁচু তাকে তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছিল। সূর্য্যের আলোকে তার গায়ের আঙ্গরাখা কিংখাবের সোণার মত ঝলমল করছিল। গম্ভীর ধীরান্দোলিত-গতি প্রতি পাদক্ষেপে তার শার্দ্দূল জীবনের পূর্ণ যৌবন আর পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়েছিল। তার এই নশ্বর কমনীয় অথচ রাজোচিত মহিমান্বিত মূর্ত্তি আমাকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে আমি গুলি ছুঁড়তে কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব

করে ফেলেছিলাম। লক্ষ্য স্থির করতে এ বিলম্ব হয় নি। কাঁধের নীচে এক গুলির আঘাতেই সে পড়ে গেল। তবু সাংঘাতিক আর একটি স্থানে আবার একবার গুলি করলাম। এত কাছাকাছি ছিলাম যে দ্বিতীয় গুলি অবশ্যকর্ত্তব্য জেনেই করেছিলাম। অনভিজ্ঞ লোকে মনে করতে পারে এটা নিতান্ত অপব্যয়।

বড় জানোয়ার শিকার করবার বিশেষ আনন্দগুলো নিতান্ত উপরি পাওনা—ফাউ—কপাল জোরে জুটে যায়। সে গুলি যেন শিকারীর টুপীর বাহার কতগুলি বাড়তি পালক। এ পালক কিন্তু আমার এক গোছা জমেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিবিধ উপায়ে পাওয়া, স্বীকার করা ভাল। অনেক বার এ সব সময়ে আমার লক্ষ্য-নৈপুণ্য প্রভৃতির বহু প্রশংসাবাদ পূরাদস্তুর অতি মাত্রায় গ্রহণ করেছি; কিছুমাত্র বিচলিত হই নি। একটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একটা বাঘ ভোরের কিছু পূর্ব্বে একটা মস্ত গরু মেরে রেখে চলে যায়; অথচ আপন গতিবিধির কোন নিদর্শনই রেখে যায় নাই। শিকার করে রেখে গিয়েছিল বটে কিন্তু একটা গ্রাসও উদরস্থ করে নি। তাই রাতের বেলা তার ফিরে আস্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। যে সব লোকেরা শিকারের সন্ধান নিয়ে আসে তারা এ বাঘ যে কোথায় বাসা করেছে তার সন্ধান বল্‌তে পারলে না। তাই আমরা মনে করলাম যে দিনটায় অন্ততঃ বন আর একবার ওলটপালট করায় ক্ষতি নাই! ভোর না হবার আগেই তারা যাত্রা করেছিল, আর সন্ধ্যা যখন ঘোর করে আসছে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাদের সঙ্গে দেখা হ'বামাত্র তাদের আকার ইঙ্গিতে কৃতকার্য্যতার লক্ষণ সুস্পষ্ট বোঝা গেল। যেখানে মরা গরুটি পড়েছিল সেখান হতে ক্রমে তারা হত্যাকারীর আশ্রয় স্থানটী আবিষ্কার করেছিল। যখন খেতে যান তখন ব্যাঘ্রবীর ১০ হাত চওড়া নালা এক লম্ফে পার হয়ে গিয়েছিলেন! ক্ষুধা নিবৃত্তি করে গুরু-নেতে ভারী হয়ে ফিরবার সময় এমন ক্ষিপ্রগমন সুবিধাজনক না হওয়াতে সাঁত্‌রে নালা পার হয়েছিলেন। জলটা তখনও ঘোলা হয়েছিল। জল যে তখন পরিষ্কার হয় নি, কাদা গোলা ছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে বাঘটি অল্পক্ষণ আগেই পার হয়ে গিয়েছে। আমার বাম দিকে, বল্‌তে গেলে ঠিক আমার পিছনেই, নিরাপদে গাছের ডালে একটি লোক বসেছিল। বাঘ যদি সে পথে আসে তবে তাকে থামাবার ভার এ লোকটির উপর ছিল। জঙ্গল যারা পিটয় তারা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, কিন্তু বাঘের কোন সন্ধান নেই। ছোট্ট ছোট্ট পাখী, খোলা জায়গায় উড়ে বেড়াতে যারা ডরায়, আমার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। আমাকে খাতিরেই আনলে না। দু একটা ছোট ছোট ডালে এসে বসল। ডালগুলি দুলতেই লাগল। সেই ক্ষীণ শব্দে মনে হতে লাগল বাঘ বুঝি আস্‌ছে,কিন্তু ক্রমে আসল কারণ জানা গেল। আমি ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। জঙ্গল পিটন প্রায় শেষ হয়ে এল, অথচ আমার পিছনে যে লোকটি বাঘকে বাধা দেবে বলে অপেক্ষা করছিল তার কোন সাড়াই নেই। ভয়-বিহ্বল একটি ছোট পাখী আমার পেছন দিয়ে সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল। আমি যেমনই ফিরে বস্‌লাম অমনই হাত খানেক দূরে এক নজর উজ্জ্বল গুলবসান একটা পোষাকের একটু খানি দেখতে পেয়ে বন্দুক ঘুরিয়ে নিয়ে আমি গুলি করলাম। কি যে হ'ল তা বুঝবার কোন উপায় ছিল না। সম্মুখের জঙ্গল এমনি ঘন যে তার মধ্যে দৃষ্টি চলে না। গুলির ফলাফল অনুমানও করতে পারলাম না।

গুলির শব্দে, যারা বন পিটিয়ে এগিয়ে আসছিল, তারা থেমে গেল। আমিও ঝোপের মধ্য হতে

বেরিয়ে যে পথে বাঘ চলে গিয়েছে সে পথ পরখ করতে আরম্ভ করলাম। বাঘ মোটেই বাহিরে যায় নি। আরো একটু তত্ত্ব তল্লাসে জানা গেল যে লোকটী বাঘের পথ আটকাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল সে তখনও সেইখানটীতে আছে। বাঘটি এমনি চুপি চুপি তালগাছের কাছে এসেছিল যে চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে কথা সে টেরই পায় নি। আর তার পর যখন চলে গেছে তখন মৌনাবলম্বন নিরাপদ বোধে নিঃশব্দে ছিল। আমরা যত দূর দেখতে পাচ্ছিলাম তত দূর অনুসন্ধান আর আবিষ্কার দুই সহজ হয়ে এসে ছল। আমরা সাবধানে এগিয়ে এসে এক নজরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম,—দেখলাম বাঘটি কাপড়ের বাণ্ডিলের মত জড়সড় হয়ে পড়ে আছে,—একেবারে নড় চড় নেই, পাষাণের মত প্রাণহীন, গুলিটা তার বাঁ কাণের গোড়ায় লেগেছে! হাতফস্‌কে এমন জিত আর কখনও হয় নাই।

সপ্তাহের শেষে ছুটির দু'দিন শিকার চেষ্টায় দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। যে লোকটি আমার বন্দুক সব পরিষ্কার করে রাখে তার ভুলে দুটী দিন মাটি হয়ে গেল। চারশ' পঁয়ষট্টি নম্বর গুলির বন্দুক না দিয়ে সে ৪০০।৫০০ নম্বরের গুলির বন্দুক দিয়েছিল। এ দুটি বন্দুক এক জুড়ি যমজ ভাইএর মত; একটিকে অন্যটা হতে চিনে নেওয়া দুষ্কর। আমারও দোষ কতকটা যে ছিল না তা নয়। প্রতিবারই আমি সব নিজে চোখে দেখে নি, এবারে আর তা করি নি। খবর এল বাঘ গরু মেরেছে, আমিও যাবার জন্য তৈরি হলাম। বন্দুক নিতে গিয়ে নির্ব্বোধের মত এই ভুল আবিষ্কার হল। তখন আর কি করা যায়, ফিরে আসতে হল। দুঃখের ফিরে আসা! যদিও মানুষটি যেমন গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক জ্ঞানী হয়েই ফিরে এল।

এক পক্ষ কাল ব্যাঘ্রবীর মনের আনন্দে খুনখারাপি, ডাকাতি করে বেড়াতে লাগলেন। আরও কতকগুলি গরু মারা পড়ল। তার পর আবার আমি যখন গিয়ে উপস্থিত হলাম, আগের রাতে বৃষ্টি হবার দরুণ ভিজে পথে পায়ের দাগ খুঁজে পাওয়া আরও সহজ হল। যারা তার খোঁজে ফিরছিল, তারা বল্লে হাজার হউক বাঘতো আর আকাশে পা করে হাঁটবে না, অনায়াসেই তার খবর নিয়ে আসব। হলও তাই। শ্যাওলা আর জলেভরা পুরাণ খালের ধারে একটা বেতবনে তার সন্ধান পাওয়া গেল। সহজে জলে নামবার তার সম্ভাবনা ছিল না। তাই খালের ধারে ধারে তাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত করা গেল। বাঘটি ঠিক এ পথ পেরিয়ে যায় নি। একটি গাছের শিকড়ের কাছাকাছি গুড়ি সুঁড়ি হয়ে লুকিয়ে বসেছিল। তার পর শেওলা পেরিয়ে জল সাঁতরে একটি ছোট্ট দ্বীপের উপর গিয়ে আশ্রয় নিলে। যেখানে গিয়ে শক্ত হয়ে সে বসেছিল সেখান হতে তাকে নড়ান শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অবশেষে গজরাজ মোহনলাল আর সমস্ত শিকারীর ছলবল-কৌশল একত্রিত হওয়ায় নড়তে তাকে হলই। আমি আমার ডান দিকে চেয়ে দেখলাম সেই দিকটাই তার পলায়নের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি যা মনে করেছিলাম আর যেটা সচরাচর ঘটে থাকে তা হলনা। সে দক্ষিণ মার্গ ত্যাগ করে বাম মার্গের পথিক হল। তাই আমার গুলি একদম ফস্‌কে গেল। বেলা পড়ে গিয়েছিল বলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পার হয়ে এল। আমরা দুঃখিত মনে অথচ আশায় নির্ভর করে পর দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

নিশাচর বৃত্তি চরিতার্থ করবার সময় সে কি শুধু কৌতূহল পরবশ হয়েই আমরা পূর্ব্ব দিন যেখানে টুল নিয়ে পাহারায় বসেছিলাম সেই জায়গাটি পরিদর্শন করতে এসেছিল? চলাপথ একটু তফাতে

রেখেই সে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তবু নখ দিয়ে আঁচড়ে কেটে আপন আগমনের নিদর্শন রেখে যেতে ভুলে যায় নি। এ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? সে যে আমাদের কাণাকড়ির পরোয়া রাখে না, সেইটে জাহির করবার জন্যেই কি পায়ের নখের লেখায় সে কথা প্রকাশ করে গেল? যদিও এবারেও আমরা তাকে খুঁজে পাই নি। তবু সে বেশী দূরে ছিল না, তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা বিফল হল। শিকার খুঁজে বার করা যাদের কাজ তারা বাঁশ ঝোপের পাশেই বেরিয়ে আসবার পথে আমরা যে পথ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তার একটু তফাতে বাঘের পায়ের টাটকা দাগ দেখতে পেয়েছিল। সেখান হতে চুপি চুপি বেরিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা দুএকটা সম্ভব জায়গায় তার খোঁজ করেছিলাম কিন্তু নাগাল পাই নি। পর দিন সে আরও একটু কাছে এসেছিল সত্যি, কিন্তু যারা বন পিটিয়ে শিকার উটকে বার করে তারা তার খোঁজ করতে পারে নি। পরে আবিষ্কার হল সে জলচর বৃত্তি অবলম্বন করে একটা খাড়াই পাড়ের উপর আশ্রয় নিয়েছে। এদের জাতীয় জীব এই রকম জায়গায় আস্তানা করতে ভারি ভালবাসে। একটা বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে আমি বসেছিলাম। সেখান হতে বিশ হাত দূরে মোড় হতে বাঘের আসবার রাস্তা দুটো দুধারে চলে গিয়েছিল। এখন সমস্যা দাঁড়াল, যদি সে বামমার্গ অবলম্বন করে তবে ঝোপের আড়ালে থেকে বেশ একটু দূরে হতেই গুলি চালান চলে; কিন্তু যদি দক্ষিণ মার্গের পথিক হয় তবে হয়ত হাত দুএক ব্যবধানে একেবারে প্রায় বন্দুকের নলের মুখে এসে পড়বে। যখন খোলা জায়গা দিয়ে দুল্‌কি চালে এগিয়ে আসতে লাগল তখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি যে ইচ্ছা করেছিলাম তা ঘটল না। বাঁদিকে সে গেল না। তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠতে লাগল। বাঁশের আড়াল দিয়ে তার ঘাড় আর মাথা দেখতে পেয়ে আমার বন্দুক ঘুরিয়ে নেবার সামান্য শব্দ হবামাত্র সে আমার দিকে মুখ ফিরাল। গুলিটা ব্যাঘ্রবীরের ভ্রূ-মধ্য বিন্দুতে লাগল, আর তার ইহ জীবনের হিসাব নিকাশ একেবারে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার কপাল জোরে শিকারী জীবনে সাত বার ছাড়া আমাকে কখন বাঘে আক্রমণ করে নি। এর মধ্যে চার বার তারা নিজেরাই আমার গুলির আঘাতে এত বেশী কাতর হয়ে পড়েছিল যে তাদের আক্রমণে বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর একবার সোজা আমার ঘাড়ে এসে পড়তে পড়তে হঠাৎ কি মনে করে ভিন্ন পথে চলে গিয়েছিল। আর একটা আক্রমণে যখন বাঘ নীচে হতে আমার দিকে আসবার চেষ্টায় ছিল তখন আমি নিজে হতেই গুলির জোরে সামলে নিয়েছিলাম। উপরে থাকার দরুণ এ বিষয়ে আমার সুবিধাও ছিল বেশী। সপ্তম আক্রমণটি সব চেয়ে ভয়ানক। সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক। ঘটনাটির বৃত্তান্ত হচ্ছে এই। জঙ্গলটা তেমন বড় ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি খোঁচাখুঁচির পর প্রকাণ্ড এক শুয়োর হঠাৎ এক লম্ফে পলায়ন করলে। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল বরাহ অবতার সারা রাত ধরে ক্ষেতের উপর তাণ্ডব অভিনয় করেছিল। ভোরের বেলা বিশ্রামের জন্যে আপন আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু সেটি পরহস্তগত দেখেই স্বাধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টা মাত্র না করে, আক্রমণ অপেক্ষা "Glorious retreat" সেখানে বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞানে পলায়নতৎপর হয়েছিল। যে ব্যক্তির উপর শিকার সন্ধানের ভার ছিল তার বয়স অল্প। স্বভাবতঃই কল্পনা প্রবণ ও উৎসাহী। তার অনুরোধে আবিষ্কারের ফলাফল পরীক্ষা করে জানতে পারলাম বরাহবীরের পূর্ব্বেই শার্দ্দূলরাজ বনটি অধিকার করেছিল। শূকর যখন এই সত্য

জানতে পারলে তখন অসন্তোষজনক বিপদের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হওয়াই সমীচীন বিবেচনা করেছিল। দার্শনিক Hobson'এর মত এ ক্ষেত্রে আমারও কাজের দুটি পথ ছিল,—হয় করা নয় ছাড়া। শেষ পথ আমার মনে নেয়নি। আমি অতি সাবধানে নিঃশব্দে আমার টুলটি খুলে বিছিয়ে বসে বিপিনকে অন্য শিকারীদের ডাকতে পাঠালাম। তারা অদূরেই প্রতীক্ষা করেছিল। পাছে সতর্ক শিকারটি পালিয়ে যায় এই ভয়ে এতক্ষণ অগ্রসর হয় নি। কাছে একটাও বড় রকম ঝোপ ঝাড় ছিল না যার আড়ালে আত্মগোপন কর্ত্তে পারি। যে বেতবনে বাঘটি আশ্রয় নিয়েছিল তার আর আমার মধ্যে খুব খাটো গুটিকত গুল্মের ব্যবধান। একটু দূরে একটা বাঁশঝাড় ছিল, কিন্তু সেখানে এগোতে গেলে হয় বাঘকে নৈকট্য সম্বন্ধে সংবাদ দিতে হয়, নয়ত তাকে হঠাৎ আক্রমণের সুবিধা দেওয়া হয়। কাজেই আমার ঠাঁই-নাড়া হবার উপায় ছিল না। যেখানে আমি বসেছিলাম তার তিন দিকে খোলা মাঠ। যদি প্রথম গুলিতেই শিকার না মারা পড়ে তাহলে তার পলায়ন পথটী পাহারা দিয়ে থাকা নিজের পক্ষে কত বিপদজনক তা বুঝতে বিশেষ আয়াস করতে হয় নি। যদিও এ সব সময়ে হ্যাটমাথায় রাখাই আমার অভ্যাস তবুও সেটা বড় নজরে পড়ছে বুঝে খুলে ফেলতে হল। হ্যাট মাথায় রাখবার বিশেষ সুবিধা আছে। আমি স্বচক্ষে তার সাক্ষ্য পেয়েছিলাম বলেই এ কাজ করতাম। একবার মাথায় টোকাধারী একজন কৃষকের উপর বাঘ এসে পড়েছিল। চাষা বেচারী শিকার করবার মতলবে আসে নি, দেখবে বলেই এসেছিল। বাঘ এসে থাবা মারতেই সে ত মাটীতে পড়ে গেল। তার পর বাঘেমানুষে এম্নি জড়াপুঁটুলি পাকিয়ে গেল গুলি মারলে কার গায়ে যে গিয়ে লাগবে বুঝতে না পেরে মন স্থির করবার আগেই দেখি বাঘ পালিয়ে গেছে। কৃষকের কাছে গিয়ে দেখি তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি। মাথা ঢাকা টোকাটি তুবড়ে গেছে বটে কিন্তু মাথায় কিছু হয় নি। হ্যাটবিহীন অবস্থায় বসে রইলাম বটে, কিন্তু এমন নিরাবরণ অবস্থা সুখের মনে হচ্ছিল না। বন-পিটোন যাদের কাজ তারা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু দুচার পা যেতে না যেতেই ঘাসের মধ্যে খুব একটা খসখস শব্দ শুনতে পেয়ে মনে করলাম বুঝি মস্ত একটা শূয়োর আসছে। আমার ভুল হয়েছিল। দেখলাম বাঘটা তীরবেগে বেরিয়ে এসেছে। আমার গুলিটা ভাল করে লাগল না লাগল বুঝবার আগে বাশঝাড়ের পাশে এসে পড়ে গেল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে ভয়ানক গর্জ্জন করে আমায় আক্রমণ করলে। যেন তার কিছুই হয় নি। আমি তখনও বুঝতে পারি নি এখনও বলতে পারিনে বন্দুকের অন্য নলটা তার উপর খালি করেছিলাম কি না। কেন না সমস্ত ঘটনাটা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ঘটে ছিল। কিন্তু যা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে তা হচ্ছে এই। বাঘটা ডিগবাজী খেয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে অন্য ধারে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল। যাবার সময় তার গায়ের বাতাসের ঝাপটা আমার মুখের উপরে এসে লাগল। আমার দিকে মাথা করে সে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। যদিও বুঝতে পারলাম সে একেবারে মারা পড়েছে তবুও সাবধানের বিনাশ নেই জেনে আমি বন্দুকটা আবার ভরে নিয়ে তার কাছে এগোলাম। কেন যে আমার উপরে এসে না পড়ে অন্য দিকে গিয়ে পড়ল বোঝা কঠিন। তবে বোধ হয় বুকে যে তার গুলি লেগেছিল তাতেই সে মারা পড়ে। কিন্তু মরবার পরও অনেক সময় দেখা যায় পিঠদাঁড়ার বিপরীত গতিতে মৃত শরীর অনেক সময় উল্টো দিকে গিয়ে পড়ে। এখানেও তাই ঘটেছিল। সে যে লাফিয়ে পড়েছিল সেটা স্বেচ্ছাকৃত নয়,—দেহযন্ত্রের ধনুষ্টঙ্কারের মত কোন অভাবনীয় ব্যাপার। সব যখন

শেষ হয়ে গেছে তখন আমার মনে হতে লাগল আমার শরীরটা যেন হিম হয়ে আসছে। শিকারী-দের মধ্যে একজন দেখালে বাঘের ক্ষত হতে কতকটা রক্ত আমার বাঁ পায়ের জুতোর উপর পড়ে জমে গেছে। কতটুকুর জন্যে সে যাত্রা প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছি তা আর বুঝতে বাকী রইল না।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন শিকারে যাবার সময়, অসময়ে ব্যবহার করব বলে কোমরে আমি পিস্তল নিয়ে যাই কি না। বাছা কল্যাণ, এ কাজ আমি কখনই করি না। এ নিয়ে যাওয়াটা শুধু যে অনাবশ্যক তা নয়, বিশেষ বাধাস্বরূপ। সঙ্গে আমি একখানি ছোরা নিয়ে যাই সত্যি, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই ভরসা রাখি সেটা ব্যবহার করবার কারণ উপস্থিত হবে না। যে বিদ্যুৎগতিতে বাঘ কিম্বা চিতা তোমার উপর এসে পড়ে তাতে ছোরা বার করবার অবসর বড় একটা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বারের গুলি যদি তোমায় রক্ষা না করলে তবে আর কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না। প্রথমতঃ, তোমার সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, আর কার্য্যকুশলতা, দ্বিতীয় তোমার ভাগ্য। এই দুই রক্ষাকবচ তোমার বিপদ বারণ কিম্বা তোমায় বিপন্মুক্ত করতে পারে। আবার অনেক সময় এ আক্রমণ যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। কিম্বা বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়ার মত বিশেষ মারাত্মক কিছুই নয়।

মানুষ প্রিয়-প্রসঙ্গে কথা কইতে বড় ভাল বাসে। এ স্থলে আমার প্রিয় ব্যাঘ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। আশা করি তা পাঠকের শ্রান্তিজনক হবে না। কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হওয়াও সম্ভব। একবার একটা বাঘ না জেনে শুনে লাফিয়ে পড়ে শূয়োর ধরা একটা জালের মধ্যে কেমন করে আটকিয়ে পড়েছিল, সে ঘটনা এখানে বলা চলবে। তখন আমার তরুণ বয়স। মৃগয়া ব্যবসায়ে সবে ব্রতী হয়েছি। কি ভাবে শিকারী জন্তুর পদাঙ্কানুসরণ, অনুসন্ধান এবং তার বাসস্থান আবিষ্কার করতে হয় তারই শিক্ষা-নবিশী করছি। স্কুল কলেজে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি হলেই জাল নিয়ে আমি শিকারীদের সঙ্গে বনে বনে বুনো শূয়র ধরবার চেষ্টায় ফিরতাম। এ কাজে আমোদ ছিল; বিশেষতঃ বড় বড় শূয়রদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টার মধ্যে একটু বিপদের ঝাঁজ থাকবার দরুণ কাজটা আরও লোভনীয় আর রুচিকর বোধ হত। জালটা গুটিকত ছোট বাঁশে বেঁধে জড়িয়ে দিয়ে বন হতে বেরোবার পথে অন্ত দুধার গাছের গুঁড়িতে বেঁধে দেওয়া যেত। তার পর শিকারীরা তাকে তাড়া দিয়ে সে দিকে নিয়ে আস্‌ত। তাড়া খেয়ে জাল ডিঙ্গিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক তাড়াতাড়ি মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আটকা পড়ত। বর্ষা কাছেই থাকত, বন্দী না লাফাবার আগেই তার বিনাশ সাধনই হচ্ছে শিকারীর কাজ। এই জন্যই স্থিরলক্ষ্য, দৃঢ়তা আর সাহসের আবশ্যক হয়। দু-দুবার আমি দুঃখে পড়েছিলাম। একবার শূয়রের তাড়নায় ডিগবাজী খেয়ে নালায় গিয়ে পড়ি; আর একবার পড়ে যাবার পরে শিকারীরা এগিয়ে আসছে, শূয়োর ও তাড়া করবে মনে করেছে, এমন সময় সে নিজে অক্ষত শরীর ছিল বলেই কিম্বা অন্য কি কারণে বলতে পারিনে সে ভিন্ন পথে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর পর্য্যন্ত জালটাকে টেনে নিয়ে গেল। কেমন করে দুই দিকের জাল খুলে এল, সে সমস্যা পুরণ কঠিন নয়। বাঁধা আলগা ছিল। খুলতে দেরী লাগে নি।

একদিন আমরা এক প্রকাণ্ড বাঘের পিছনে ফিরছিলাম। বন্দুকধারী মোটে দুজন; অথচ পলায়নের পথ বহু। তাই আমারই বুদ্ধিতে অন্য অন্য পথে বাধা দেবার জন্য জাল বিছিয়ে দেওয়া হল। বাঘ আমার দিকেই আসছিল; কিন্তু আমার নড়াচড়ার দরুণ অন্য দিকে ফিরে গেল। তবু তার পিছনের

পায়ে এক গুলি আমি লাগিয়ে ছিলাম। জাল যে দিকে বাঁধা ছিল একটু পরেই সেই দিক হতে বাঘের গর্জ্জন শুনে আমরা তাড়াতাড়ি অথচ সাবধানে সেখানে গিয়ে দেখি কি, গুলদার কোটপরা বাঘমশায় সেই জালে পড়ে, জালে ধরা মাছের মত লম্ফ-ঝম্প দিচ্ছেন। বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করবার আর সময় ছিল না, কেন না বিপদ-জাল সে প্রায় কাটিয়ে উঠছিল, এমনি সময় পিছন হতে একটা গুলি তার কাঁধের উপর পড়ে লম্ফ-ঝম্প তর্জ্জন গর্জ্জন সব চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দিলে।

৫ই জানুয়ারী ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

খৃষ্টমাস, অর্থাৎ বড়দিন, বৎসরে শুধু একবার করেই এসে থাকে। ইংলণ্ড প্রবাসের কয় বৎসর ছাড়া এই ছুটীটা আমি আজ পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে শিকারের পিছু পিছু ফিরেই কাটিয়েছি। নূতন ক্ষেত্র আর নব নব মৃগয়ার চেষ্টায় আমি গত বৎসরে এ সময়কার ছুটীটা মধ্যপ্রদেশে কাটিয়েছিলাম। ব্যাঘ্র সম্বন্ধে ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন হয় নি। এ বিষয়ে সব চেষ্টাই কোন না কোন ক্রটীবশতঃ নিস্ফল হয়েছিল। প্রত্যেক মৃগয়া যাত্রাই শিকারীর ভাগ্যে সফলতার স্মৃতি বহন করে আনে তা নয়। এবার এক জোড়া সম্বর (Samber) আর একটা ছুটো ভালুকেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল।

প্রান্তরবাসী ঋক্ষ মহাশয় আমুদে হলেও মানুষকে বিপদে ফেলবার ওস্তাদ। তবে বিধিমতে এ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হলে আমোদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঘ ও চিতার মত এর দৃষ্টিশক্তি অত তীক্ষ্ণ না হলেও ঘ্রাণশক্তি উভয়ের অপেক্ষা অধিক। গতিবিধি তেমন সুন্দর না হলেও লোকে তাকে যতটা গজেন্দ্রগমন মনে করে তা নয়।

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি ?"

এ সময় তার সম্মুখে গিয়ে পড়া নিরাপদ নয়। সে বিশেষ বলী আর সহজে হার মানে না। আহত হয়েও সে যেমন দূর পথ অতিক্রম করে যেতে পারে বাঘের পক্ষে তা অসাধ্য। বাঘ যে আঘাতে মুহূর্ত্তেই ঘুরে পড়ে যায় ভল্লুক সেখানে কিছু দূর পর্য্যন্ত না গিয়ে ভূমিশায়ী হয় না। আহত হলে কিম্বা পালাবার পথ না পেলে সে যে ভাবে সোরগোল সুরু করে সেটা আদপেই শ্রুতি-সুখকর নয়। বীরের মত মরতে জানে শুধু বরাহ। গুলি লাগলে বাঘ আর্ত্তনাদ করে, আহত হয়ে পালাতে না পারলেই গর্জ্জন করে, কিন্তু ভাল্লুক যে পরিমাণ হা হুতাশ আর মরা কান্না তোলে, তার মত জবরদস্ত জন্তুর পক্ষে সেটা একেবারেই লজ্জাজনক।

যদিও এদেশীয় ভল্লুক আলাস্কাবাসী ভ্রাতার মত বৃহদাকার হয় না তবুও তার দৈর্ঘ্য ও আয়তন কিছু মন্দ না। কখন কখন প্রায় সাত ফুট কিম্বা তার কাছাকাছি হতে দেখা যায়। ঘন কৃষ্ণ রোমের মধ্য হতে তার বহিরাগত উচ্চ দীর্ঘ রোমশূন্য নাসিকা দূরে হতেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষের মত সমস্ত পায়ের পাতা দিয়ে সে হাঁটে। পথে যে পায়ের চিহ্ন রেখে যায় তাও মানুষের মত। ছাল ছাড়িয়ে নিলে তার লম্বোদর দেহ খানি রাজধানী কলিকাতার অবস্থাপন্ন স্থূলকায় বাড়ীওয়ালার মতই হাস্যকর দেখতে হয়। আর জঠরানল শেষোক্তের মতই অপরিসীম ও ভয়ানক। স্বভাবটীও আকৃতির অনুরূপ। 'ঘাড়েতে পড়েন যার, বিপদ সঙ্গীন', নখায়ুধ এই জীবটার

হাতের স্পর্শ একেবারেই লোভনীয় নয়। বিপক্ষের মুখের উপরই আক্রোশ অধিক। আক্রমণ করতে হলে সেখানেই করে, ও চিরস্থায়ী চিহ্ন খোদিত রেখে যায়। যে অবস্থায় বাঘ কিম্বা চিতা রেহাই দিয়ে যায়, যদি তুমি তার মাথায় আঘাত করতে না পার, তাহলে সে অবস্থায় সে একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ে, পেড়ে ফেলে। তখন সমূহ বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা। যে ভাবে ভাল্লুক খাড়া হয়ে দাঁড়ায় তার বুকের উপরকার ঘোড়ার খুরের আকারের সাদা রোম দিয়ে ঢাকা জায়গাটীতে সহজেই গুলি করা যায়। এমন পোষমানা জন্তু সে নয়, সেটা মনে রাখাই ভাল। ভাল্লুক শূয়োরের মতই, তার নাকটি সম্বন্ধে ভারী সজাগ। কোন রকমে সেখানে আঘাত লাগলে তারা সহজে ফিরে তোমায় আক্রমণ ও আঘাত করে।

ভালুক আক বড় ভালবাসে। যে সব চাষার আকের ক্ষেত একটু নির্জ্জন জায়গায় সেখানে এদের ক্ষেত-ছাড়া করা বড় শক্ত কাজ। পৌষের এক ভোর বেলায়, অন্ধকার তখনও রয়েছে, একজন কৃষকের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই গরীব বহুকাল ধরে অত্যাচার সহ্য করে আস্‌ছে। রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। কুঁড়ের মধ্যে কত হাঁক ডাক করেছে। কোন ফল হয় নি। ঋক্ষ তার বিলাপ প্রলাপ আক্রোশ কিছুতেই কর্ণপাত করে নি। আমি যেখানে তাঁবু ফেলে ছিলাম ক্ষেতখানা তার খুব কাছেই, ঢিল ছুড়ে নাগাল পাওয়া যায়। আমি যখন গেলাম স্পষ্ট শুনতে পেলাম ভালুকটী মনের আনন্দে সশব্দে ইক্ষুদণ্ডের রসমাধুর্য্য উপভোগ করছে। জনকত লোক সত্বর একত্র হয়ে তাকে তাড়িয়ে বার করলে, কিন্তু সে বোধ হয় আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিল। কেন না আমি যেখানে ছিলাম সেদিকে না এসে পাশ কাটিয়ে অদূর একটা পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল। এই চতুর জীবটি আর একবার আমায় ভাঁড়িয়ে অন্য এক পাহাড়ের দিকে পালিয়েছিল। কিন্তু সেখান হতে লম্ফ দিয়ে যখন নেমে এল তখন ঘাড়ে একটা গুলি খেয়ে নিঃশব্দে নালার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। চামড়া ছাড়াবার জন্যে যখন তাকে চেরা হল তখন দেখা গেল আকণ্ঠ আকে পূর্ণ।

আহার সম্বন্ধে এরা বড় শুদ্ধাচারী। বেশীর ভাগ ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করে। বল্মীক খুঁড়ে তুলে উই খেতে খুব ভালবাসে। ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে দূরে হতেই মৌচাকের অস্তিত্ব জানতে পারে। তার পর তার সব মধুটুকু নিঃশেষে পান করে। এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র দয়ামায়া দেখায় না। ফলে কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয়। একবার খবর পেলাম একটী ভাল্লুক গাছে চড়ে চাকভেঙ্গে মধু খাচ্ছে, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি তার দেখা পেলাম না। দেখলাম পাশে একটা নালায় পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাতরাচ্চে আর নিজের শরীর হতে নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মৌমাছি সন্ধান করছে। মারা পড়বার পর দেখা গেল চুরি করতে যাবার আগে মৌমাছির কামড় হতে আত্মরক্ষা করবার জন্যে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাটির বর্ম্ম ধারণ করেছিল।

আমি যতদুর জানি ভালুকেরা স্বভাবতঃ মাংসাশী নয়। নিতান্ত দায়ে পড়ে মাংস ভক্ষণ করে। তবে শুনেছি দার্জ্জিলিং অঞ্চলে প্রতি বৎসরই অনেক গরুবাছুর এদের হাতে মারা পড়ে! মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডারায় আমি একবার শিকার করতে গিয়ে দুটি ভালুকের যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিলাম সেটা এখানে বলা চল্‌বে। ১৯১৬ সালে ইষ্টারের ছুটীতে আমি সেখানে বনপরিদর্শক কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁবুতে ছিলাম। এক দিন ভোরে খবর এল চিতাবাঘে আমাদের বাংলার এক পোষা পথের উপর

একটী মহিষ মেরেছে।” গিয়ে দুটি চিতার পায়ের দাগ আবিষ্কার হল। আর দেখতে পেলাম নিহত মহিষের অতি অল্প অংশই তারা আহার করেছে। বন্য কুকুরের আবির্ভাবে বুঝতে পারলাম ব্যাঘ্রযুগল আর শম্বর হরিণ প্রভৃতি সকলেই বনের সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এ ব্যাপারে শিকার সম্বন্ধে আশা এক রকম নিরাশায় পরিণত হল। হাতে অন্য কাজ না থাকায় ঠিক হল রাতের প্রথম ভাগটা আমি কিছুক্ষণ পাহারায় বসব। গরুর গাড়ীর রাস্তার ধারে যেখানে নিহত মহিষটী পড়েছিল তার পশ্চিমে বিস্তৃত জলাশয়। যে মহুয়া গাছে মাচান বাঁধা হয়েছিল তার ডালগুলি তখন ফুলেফলে আচ্ছন্ন। তীব্র গন্ধে নেশা না হক কষ্ট বোধ হচ্ছিল। রাত প্রায় আটটায় একটা ভালুক আমার ডান ধার হতে ক্ষণে ক্ষণে হুক্ হুক্ শব্দ করতে করতে জলাশয়ের দিকে গেল। অন্ধকার রাত। আন্দাজে বুঝলাম ভালুকটী আমার পিছনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে। কিছুক্ষণ ধরে শালবনের শুষ্কপাতার মধ্য দিয়ে আর একটী জন্তু আমার ডান দিকে এল বুঝতে পারলাম। প্রথমে আমি মনে করলাম দৈবাৎ বুঝি একটী বাঘ সে দিকে এসে পড়েছে। গুরু পদক্ষেপ হলেও, বাঘের সাবধান মখমলের মত নরম পায়ের শব্দ নয়। জন্তুটি যতই চলাফেরা করতে লাগল আমার বিস্ময় ততই বেড়ে চল্‌ল। গাছের আড়ালের জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হল যেই হউক সে মৃত জন্তুটীর কাছে এগিয়ে আস্‌তে চাইলেও কি একটা কারণে সতর্কভাবে রয়েছে। দুচার মিনিট গেল, কিন্তু মনে হল সময় যেন আর শেষই হচ্ছে না। এদিকে অদৃশ্য জন্তুটীর গতিবিধির কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হল না। রহস্য ক্রমেই গভীরতর হয়ে চল্‌ল। নিরাকরণের সমস্ত আশা ত্যাগ করেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা জন্তু মোষটার উপর গিয়ে পড়ল। তার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ তার পরিচয় প্রকাশ করলে। সে গিয়ে খুব জোরে একবার মোষটাকে টানলে। বাঁধনদড়ি শক্ত, খুলে যাওয়া দূরে যাক্ উল্টে তাকেই টান দিতে সে চম্‌কে উঠল। ভয় পেয়ে সে আড়াল হতে একেবারে খোলা জায়গায় গরুর গাড়ীর রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। আর কালবিলম্ব না করে বার বার মোষটার উপর গিয়ে পড়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারলে না। এতক্ষণে অভিনয়ের অভিনবত্ব চলে গিয়েছিল। তিন চার বার চোখের সম্মুখে লম্ফঝম্প করবার পর আমি আমার Paradox গুলি করলাম। সে পড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই উঠে জলাশয়ের ঘাসে ঢাকা পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা তার লাগল না মনে হল। অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই দেখে আমি সঙ্কেত বাঁশী বাজালাম। লোকজন লণ্ঠন নিয়ে এল। আমি বাংলার দিকে গেলাম। বনবিভাগের কর্ম্মচারী আমার বন্ধু গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন। কি হল জানবার জন্যে পথে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। সকাল হবার আগে জান্‌বার উপায় ছিল না। তখন যা জানা গেল সে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

খুব ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি আমরা তদারকে বেরুলাম। আমার বন্ধু আর একটি নূতন ভালুকের পায়ের চিহ্ন দেখালেন। সে জলাশয়ের অপর দিক হতে মৃত মহিষের মাংস ভক্ষণের চেষ্টায় এসেছিল। তাই দেখে বল্লেন খুব সম্ভব আমার দ্বিতীয় গুলিটা ফস্কে গিয়েছে। হাড় কখানি ছাড়া বিপুল মহিষদেহের আর বড় কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আমি কিন্তু যে দিকে আমার ভালুকটি পড়েছিলো সেই দিক তল্লাস গেলাম। মাটিতে রক্তের চিহ্ন আবিষ্কার করে আমার মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হল। বনবিভাগের কর্ম্মচারী আর আমি তখন দ্বিতীয় অতিথির পদাঙ্কানুসরণ করে

করে আবিষ্কার করলাম সে একেবারে ভিন্ন পথের যাত্রী। কাছেই একটি নালাতে তার ভুক্তাবশেষ পড়েছিল। দেখে মনে হ'ল একবার নয় অনেকবার সে আহার্য্য সংগ্রহ করে এনেছিল। বাঘের হাত হতে রক্ষা করে এনে সঞ্চিত খাদ্য নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ করবার অভিপ্রায়েই এ কাজ সে করেছিল মনে হ'ল। আমরা তখন অন্য ভল্লুকের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে চল্‌লাম। সে সমান ভাবে চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্যে যেখানে যেখানে থেমেছে সেখানে অনেকখানি করে রক্তের দাগ। স্থানীয় শিকারী আর আমি দুজনেই একত্রে ধৈর্য্য সহকারে অনেক দূর পর্য্যন্ত তার সন্ধানে গিয়েছিলাম। পথ ক্রমে সঙ্কট, গুহাগহ্বরসঙ্কুল হয়ে উঠেছে দেখে তাকে তার ভাগ্যে যা আছে ভোগ করবার জন্যে ত্যাগ করে এলাম। প্রথম গুলিটা ঠিক বুকে না লেগে হয়ত কিছু উপরে লেগেছিল। একে অন্ধকার রাত তার উপরে তার চার ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু কাল ঘন রোম বাধা ঘটিয়েছিল আর কি। গুলিটা ইঞ্চি দুইয়ের জন্যে নির্ঘাত হতে পারে নি। আমার বন্ধু বনবিভাগের কর্ম্মচারী সারাটা জীবন বনেই বাস করেছেন। এর আগে ভালুকের এমন আমিষবৃত্তি আর কখনও দেখেন নি, বলেন।

ভালুক তার ছানাদের প্রায় পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়। যদি একটিমাত্র ছানা হয় তাহলে সে পিঠের সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে চোখেই পড়ে না। আমার একজন বন্ধু অল্পদিন হল মাচানের উপর থেকে একটি ভালুককে গুলি করেন। সেটা তখন দৌড়ে পালাচ্ছিল। যখন সে নালায় গড়িয়ে পড়ল তখন আবিষ্কার হল একটি নয় দুটি। এতে তিনি কতদুর বিস্মিত হয়েছিলেন বলাই বাহুল্য। তাঁর Paradox বন্দুকের গুলি মাতাপুত্র দুজনেরই দেহ ভেদ করে প্রাণহরণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে ইংরাজীতে যাকে বলে "Seeing double" সে ব্যাপার নিতান্তই মার্জ্জনীয়।

এই একই অভিযানে একটা বড় হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল। তার পরিণাম সমূহ বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা থাকলেও কপালের জোরে সেটা আমরা এড়িয়েছিলাম। দুন্দুভি কিম্বা কুম্ভকর্ণ প্রমাণের একটা প্রকাণ্ড ভালুক বন পিটোবার সময় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। আমার গুলি তার কাঁধের পিছনে আড়াআড়ি গলা ফুঁড়ে গেল। বড় একটা পাথরের ঢিবির পিছনে সে পড়ে গেল। আমি মনে করলাম তার হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে। এই সময় দ্বিতীয় আর একটা ভালুক আমার বাঁ দিকে দেখা দিল। খাটো পথ দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। হাতে বন্দুক ছিল Holland and Holland। আশ্চর্য্যের বিষয় বন্দুকটা আওয়াজ হয়নি কিম্বা তার কোন রকম হানিও হয়নি। কিছুক্ষণের জন্যে আমিত চোখে সরষে ফুল দেখলাম। তার পর অনেক কষ্টে গুলি করবার জন্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেলাম। ভালুক তখন একটু বেশী দূরে গিয়ে পড়েছে। গুলি যে লাগবে এমন ভরসা আমার ছিল না। তবে দৈবাৎ অনেক রকম হয়। ভালুকটাকে ধরাশায়ী হতে দেখেই আমার পতন এবং আঘাতের সব বেদনা দূর হয়ে গেল। এমন সময় শুনতে পেলাম আমার বন্ধু দুটি চিৎকার করলেন। ফিরে দেখলাম যে সব লোকেরা আমার বর্ষাতি প্রভৃতি নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, "ভালু" তাদের আক্রমণ করতে আসছে বলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে। আমি যথাসাধ্য সেদিকে দৌড়ে গেলাম। ইচ্ছামত দ্রুত যেতে পারলাম না। আমার পিঠের ব্যথা তখন ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। যাই হোক অল্পক্ষণের মধ্যেই ভালুকের কাছে গিয়ে পৌঁছিলাম। তার অবস্থা তখন আমার চেয়েও শোচনীয়। আমি গুলি করতে যাব এমন সময় সে মুখ

থুবড়ে আমার সম্মুখে পড়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথাটি বিপুল রোমশ শরীরের নীচে একেবারে পুঁতে গিয়েছে,—যেন এক বস্তা রোয়া একেবারে নিশ্চল।

ইতিমধ্যে যারা গাছে উঠে নিরাপদ হয়েছিল তাদের দুএকজনকে নেবে আসবার জন্যে অনেক সাধ্য সাধনা করতে হল। ভালুকটা সত্যি মরেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে তার গায়ে গোটাকতক ঢিল ছুঁড়ে, দু একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তার পর তাদের এগোতে দিলাম। ভালুকটা গুলি খেয়ে আমার বন্ধুর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখনই তার অবস্থা শোচনীয়। তবুও সে হার মানে নি যাবার মুখে শিকারীদের তাড়া করে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনতো বন্ধুর জলের বোতলটা ক্রুদ্ধ আক্রমণকারীর সম্মুখে ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সঙ্গে সেটিকে গ্রহণ করলে বটে, তবে বুকে তুলে নিয়ে মরে যাবার অধিক শক্তি তখন তার দেহে আর ছিল না। বুকের রক্ত ধারায় বোতলের কাপড়ের ঢাকাটি একেবারে ভিজে গিয়েছিল। মানুষটা ভালুকের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু পালিয়ে যাবার ঐকান্তিক আগ্রহে পাথরের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম গুলি খেয়ে পড়ে গিয়ে সেখান হতে উঠে আবার ১০০ হতে যাওয়া, তার পর Paradox বন্দুকের দ্বিতীয় গুলি পাঁজরের মধ্যে নিয়ে, ভাঙ্গা পায়ে শিকারীদের তাড়া করে ছিন্ন করে দওয়া;—এহতেই বোঝা যায় ভালুকটা কি রকম কাঠপ্রাণী ও মজবুত জানোয়ার! দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দৈত্যপ্রমাণ! আমিতো এর মত বিপুলকায় আর বলবান দ্বিতীয় ভালুক দেখি নি।

শিকারীকেও অনেক সময় আক্রমণ সহ্য করতে হয়। আহত জন্তুই আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে। একবার একটি অতি দুর্গম স্থানে আমারই এ দুরবস্থা ঘটেছিল। রেলওয়ে ষ্টেশন হতে আমরা মোটে ১৫ মাইল দূরে ছিলাম, কিন্তু পথটি এমন বন্ধুর আর দুর্গম যে সাধারণ একটা গাড়ীতে এ পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় পুরো দশ ঘণ্টা লেগেছিল। পাহাড়ের পথে রাতের বেলায় গরুর গাড়ীর মত এমন বিশ্রী যান আর কিছু হতে পারে না। একদিন সকালে বেলা প্রায় দশটার সময় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অস্থিচর্ম্মসার এক যুবা আমাদের তাঁবুতে এসে উপস্থিত! সঙ্গে তার একজন পথপ্রদর্শক; তার ঘাড়ে এক থাল। দৃশ্যটি অপূর্ব্ব! কেন যে এ ব্যক্তি এমন ভাবে সেখানে উপস্থিত হল জানবার জন্যে আমরা সকলেই উদগ্রীব ও কৌতূহলাক্রান্ত হলাম। গরীব বড় মুস্কিলে পড়েই এমন ভাবে এসেছিল। তার ভাই দুয়ার প্রদেশে (Dooars) কি বিপদে পড়েছে। আমি কাছাকাছি আছি জেনে অনুসন্ধান করে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে আইন-ব্যবসায়ী আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করতে এসেছিল। আমরা তাকে আহার্য্য আর পানীয় দিয়ে প্রকৃতস্থ করলে তবে সে আপন বক্তব্য নিবেদন করতে সমর্থ হ'ল। ছাগল চুরির অপরাধে কোন লোককে অভিযুক্ত করতে পারা বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় সন্দেহ নেই। (এ অপূর্ব্ব ঘটনা আমাদের রাজধানার অদূর কোন স্থানেই ঘটেছিল!) কিন্তু দুয়ারপ্রদেশে যাঁরা কর্ত্তা, বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলা যাঁরা বিচার করেন, অপরাধ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সব ভারি অদ্ভুত। এ ব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারের একটি কাঁঠাল গাছ আপন বেড়ার মধ্যে ঘিরে নিয়েছিল। এই কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে অনধিকার প্রবেশ অপরাধে শাস্তি বিধান করেছিলেন। জজ সাহেবও হাই-কোর্টের অনুশাসন মানতে অসম্মত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরও ধারণা হয়েছিল পনস জাতীয় উদ্ভিদ প্রবরকে কণ্টকিত বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করা অবৈধভাবে বন্দী করে রাখার মতই গুরুতর অপরাধ।
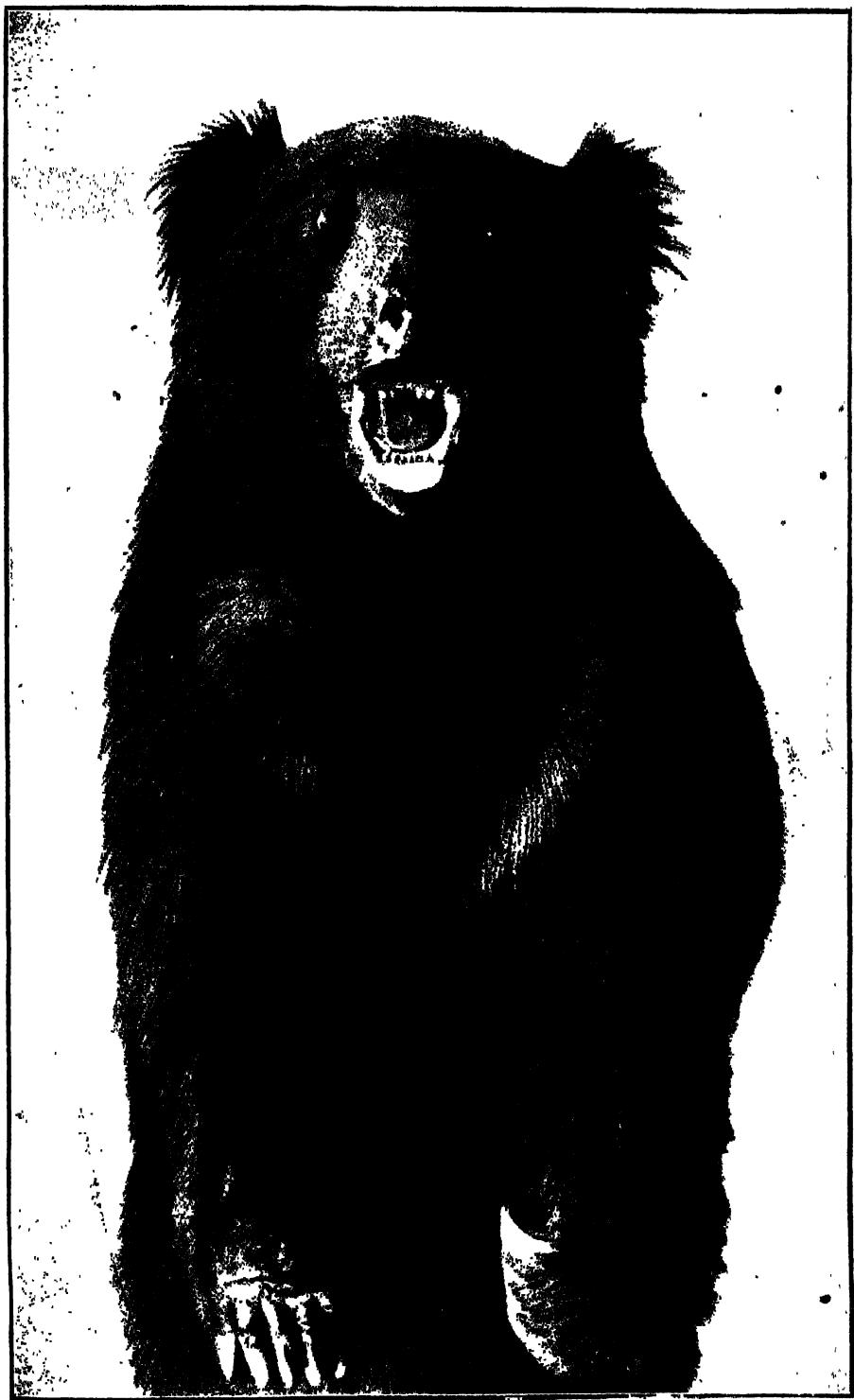
"আমিত এর মত বিপুলকায় আর বলবান দ্বিতীয় ভালুক দেখিনি।"—(৫৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে এই অবরোধ প্রথা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারীদের ফলাধিকারের সমুহ বাধাস্বরূপ হয়েছিল।তাঁরা "মা ফলেষু কদাচন", এ শাস্ত্রবিধি মানতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। হাইকোর্ট এ জটিল সমস্যার অনেকটা নিরাকরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু একার্দ্ধ (এ স্থলে উত্তমার্দ্ধ অর্থাৎ better half না থাকবারই কথা) কাজটা অপরাধ বলেই প্রতিপন্ন করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। আমিও এ ব্যাপার গাছটিকে বেইজ্জত করা ছাড়া আর কি অপরাধ হতে পারে প্রমাণ কর্ত্তে না পারায় তৎক্ষণাৎ তাকে এই অনাহূত আলিঙ্গন হতে সত্বর মুক্তিদানের আদেশ প্রায় হয়েছিল আর কি!এই মগের মুলুকে যুবকটি তার ভাই'এর পক্ষ হতে আপীল করবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিল। ছুটির বাকী কটা দিনের শিকার ছেড়ে দিয়েও আমি যদি অবিলম্বে যাত্রা করতাম তবুও আমার এ মহৎ আত্মত্যাগে লাভ বিশেষ কিছু হত না; কেননা তাহলেও আমি বিচারের সময়মত গিয়ে পৌছতে পারতাম না। যাই হোক মামলা মুলতবি রাখবার জন্যে যে আবেদন হয়েছিল সেটা ভাগ্যবশতঃ গ্রাহ্য হয়েছিল।

বুদ্ধিমান লোক সহজেই প্রশ্ন করতে পারেন ভালুক আর ভালুক শিকারের সঙ্গে কাঁঠাল গাছও তার ছায়া চুরি, বেড়ার আলিঙ্গন, ইত্যাদির সম্বন্ধ কোথায়? অপর অনৈয়ায়িক ব্যক্তির পক্ষে যাই হোক শিকারী মাত্রেই এর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ভালুকে কাঁঠাল অত্যন্ত ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ, এদের আর মফঃস্বলের জজ সাহেবের নিরপরাধীর প্রতি কর্কশ কঠোর আচরণে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। আর গত দশ বৎসরের মধ্যে এরূপ ব্যবহারে উৎসাহ লাভ করাতে ক্রমশঃ এভাব তাঁদের বেড়েই চলেছে। শেষতঃ, উভয়েই সমান হাস্যজনক। ভালুক বিনাশের তবু উপায় আছে, শেষোক্ত জীব কিন্তু অরণ্য কর্ম্মচারীর ভাষায় বলতে গেলে "মন্দির আশ্রিত" বলে তার কিছুই করবার যো নেই। ভালুকের হাত হতে রেহাই পাওয়াও সম্ভব হতে পারে, অপর পক্ষ সম্বন্ধে সে ভরসা আদৌ নেই। দন্তবিকশিত হাস্য আর সহ্য ব্যতীত নান্যঃ পন্থা।

ভালুক প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব যা আমি ইতিপূর্ব্বে কিম্বা অতঃপর আর কখনও দেখি নি, এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার একজন বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁর গুলিতে ভালুকের পিছনের পায়ে আঘাত লেগে পা দুখানি অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়। আর্ত্তনাদ করতে করতে কোন রকমে সে আপনাকে টেনে নিয়ে চলেছিল। আমরা যখন তার কাছে এসে পৌছিলাম তখন একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সে উঁচু হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে রেগে নিজের শরীরে কামড় দিয়ে অনেক খানি মাংস তুলে ফেললে। কিন্তু তখন তার বুকের উপরে গুলি লাগাতে মাটীতে গড়িয়ে পড়ে ইহলীলা সম্বরণ করলে! পরে আবিষ্কার হল সে ক্ষত স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করবার জন্যে তার মধ্যে পাতা পুরে দিয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যে পালাবার সময় পথে মাঝে মাঝে থেমে গাছ গাছড়া উপড়ে নিয়েছিল।

ভালুক শিকারের জন্যে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করে থাকার মধ্যে কোন আমোদ নেই। আহার চেষ্টায় তার আসা যাওয়া বড় অনিশ্চিত। তাই, বন্দুকের ভাষায়, সহসা তাদের সঙ্গে পরিচয়ের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকলে ফলে শ্রান্তি আর বিরক্তি ভিন্ন আর বড় কিছুই লাভ হয় না। যে সব প্রদেশে ভল্লুকের বহুল বসতি, যথাকালে, বিশেষতঃ মহুয়া ফুল যখন ফোটে, সেই পুষ্পিত মধু ঋতুতে তার সাক্ষাৎকার দুর্লভ নয়। দেখতে জন্তুটি যেমন হাস্যজনক হোক না ব্যবহারে বড় সহজ নয়, বরং ভয়ানক। তার গতি রোধ করতে হলে যেমন স্থিরহস্ত হওয়া আবশ্যক তেমনই গুরুভার গুলিও

আবশ্যক (নিটোল ৪৮০ গ্রেণ ওজনের গুলি ছাড়া বড় একটা কাজ হয় না)। তার নখর এবং দন্ত দুই বড় ভয়ানক। আর অতি সামান্য কারণে কিম্বা অকারণে শারীরিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সর্ব্বদাই সে এই অস্ত্র যুগল ব্যবহার করবার জন্যে সততঃ ও সত্বর উদ্যত হয়।

১০ই জানুয়ারি, ১৯১৮ খৃঃ।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

গৌর বা ভারতীয় বাইসন (যদিও এখানে তাকে অভিহিত করা সমীচীন কিনা বলতে পারি না) রাজোচিত গৌরব ও পদবীর যোগ্য। ও ঋষভ জাতীয় এই জীবের বিপুল বপু রাজযোগ্য। ইহারা মান্যপদ এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধনেও দুর্লভ। আরণ্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার ফলে তবে তার আবিষ্কার এবং সন্দর্শন লাভ হয়। এই সব কারণে তাকে লাভ করা মৃগয়ানুরক্ত ব্যক্তির জীবনে যুগপৎ স্বপ্ন এবং দুরাশা। কোন কোন প্রদেশে হয় তাদের সমূলে নির্ব্বংশ নয় গভীরতম অরণ্যে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। আজকাল বড় আকাঙ্ক্ষার গৌরশৃঙ্গযুগল লাভ করতে হলে শিকারীর অসীম ধৈর্য্যগুণ আর অপরিসীম কার্য্যতৎপরতা আবশ্যক। তাকে পেতে হলে তার অভিমত স্থানে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হয়। দিনের পর দিন লুকোচুরি খেলাতেই কেটে যায়। আর বৎসরের যে ঋতুতে এ খেলা খেলতে হয় তার ফলে ম্যালেরিয়া না হয়ে যায় না। পরিণতবয়স্ক এই বৃষপুঙ্গব যখন গম্ভীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয় কিম্বা আন্দোলিত গতিতে দৌড়ে চলে সে সুন্দর দৃশ্য একবার দেখলে ভুলবার নয়। তার শুভ্র দেহ হাঁটুর নীচে হতে খুর পর্য্যন্ত দুধের মত সাদা। হ্রস্ব পদচতুষ্টয়, বড় বড় সুনীল দুটী চোখ, উন্নত শরীর, প্রকাণ্ড মস্তক নির্জ্জন গভীর আরণ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করে। গবাদি জাতীয় অন্য জীবের মত তার গলকম্বল নেই। ললাট ভাগ গাঢ় কপিশ বর্ণের রোমে আবৃত। এই ললাট ভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, দীর্ঘ সুগঠিত, শৃঙ্গযুগল সমাবেশে দ্বিগুণ মহিমান্বিত। উন্নত শৈলে, গভীর উপত্যকায় কতবার শ্রান্তপদে এই সতর্ক সাবধান জীবটার অনুসরণ করেছি। এমন সব স্থানে বাতাসের গতি সর্ব্বদা তোমার অনুকূল হওয়া অসম্ভব। কাজেই সমস্ত দলটার যখন পদশব্দের আভাস পাওয়া মাত্র ত্বরিতগতিতে উপত্যকা প্রদেশের গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সমস্ত মন হতাশার আক্ষেপে মগ্ন না হয়ে পারে না। দিনের পর দিন ধৈর্য্য ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্বেষণের পর হঠাৎ যখন দেখা যায় এই কৃষ্ণ গৌর পায়ে সাদা মোজা পরে দ্রুতগতিতে বনের মধ্যে দূর হতে দূরে প্রয়াণ করলে, একটা গুলি দিয়ে সম্ভাষণ করবারও সুযোগ হল না, তখন মন বড় দমে যায়। আবার হয়ত ক'দিন ধরে সব বেশ চলেছে, কেবল আকাশে রৌদ্রের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, বাতাস চলতে একেবারে নারাজ, চারি দিকে গুমই করে আছে, এমন সময় মহা সমারোহে যোদ্ধ বেশে বর্ষা এসে দেখা দিল। আকাশে ঘন কাল মেঘ ব্যূহ জমা হয়ে সমস্ত আলোককে নির্ব্বাসিত করলে, উৎক্ষিপ্ত কুয়াশার অত্যাচারে শৈল মালা অদৃশ্য হয়ে গেল, অশনি তর্জ্জনে চারি দিক কম্পিত শব্দিত, প্রতিধ্বনিতে শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্লাবন ধারায় বৃষ্টি নেমে এসে পথ ঘাট, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও, ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগল। শিকারের আশা ভরসা সব ইতিপূর্ব্বেই ধুয়ে মুছে গিয়েছিল; তখন বাকি ছিল শুধু তাঁবুতে ফিরে যাওয়া। আকাশের দুর্ব্ব্যবহারে পৃথিবীর দুরবস্থায় ক্রমে তাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই সব অসুবিধার মধ্যে কিছুকাল ধরে একটানা অত্যধিক পরিশ্রমের পর বহু নিরাশার ভিড় ঠেলে যখন অভীষ্ট

"—ললাটভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, দীর্ঘ সুগঠিত শৃঙ্গযুগল সমাবেশে দ্বিগুণ মহিমান্বিত।"—(৬০ পৃষ্ঠা)

লাভ হয়, আকাঙ্ক্ষিত শৃঙ্গযুগল অধিকারে আসে, গৃহের শোভা এবং গৌরব বৃদ্ধি করবার আশা সফল হয়, তখন সে কি আনন্দ ! স্মৃতিতে কত দিনের অভিনয়ের মধ্যে বার বার ফিরে যেতে পারাও সুখের কথা। অধ্যবসায় যখন সার্থক হয়েছে, আকাঙ্খার ধন করতলগত হয়েছে, শ্রান্তি উদ্বেগ তিরোহিত হয়েছে, ভগ্নস্বাস্থ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈরাশ্যের বেদনা সত্ত্বেও, স্মৃতির সাহায্যে বারম্বার অতীত দিনের রঙ্গ ভূমিতে ফিরে যাওয়া, সে দিনের পুনরাভিনয় উপভোগ করা ও কম সুখের কথা নয়।

গজরাজ ভিন্ন কারও সঙ্গে এদের আত্মীয়তা নেই, বন্ধুত্ব কিম্বা বসবাস নেই। অনেক সময় এদের বন্দী করবার অভিপ্রায়ে গজরাজেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়; কারণ তার আকস্মিক আবির্ভাবেও এরা কোন সন্দেহ করে না। যদি বারম্বার তাদের উৎপাত করা না হয় তবে এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোন প্রকার কু-অভিসন্ধি আছে এ কথা তাদের মনে উদয় হয় না। যেখানে এরা বহু সংখ্যায় বাস করে অনেক সময় বিবেচনা-রহিত শিকারীরা অনর্থক তাদের হত্যা করেন। এ নিষ্ঠুরতা রোধ করবার কোন উপায় নেই বলে সেই প্রদেশে দিনের পর দিন এদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছে। তবু গহন অরণ্যবাসী গৌর জাতি যে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে এমন আশঙ্কা হয় না। এক ত তাদের বাসস্থান দুর্গম, তার উপর বিস্তৃত।

যখন আমি গৌর জাতির রীতি ও চরিত্রের সম্বন্ধে আরো অভিজ্ঞতা লাভ করব তখন তোমাদের সে কথা বলব। গবাদি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই পুঙ্গবের অনুসরণে আমাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় অধিক তাঁরা বলেন সহ্য শক্তিতে এদের সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। জীবনীশক্তিও অপরিসীম। ·৪৬৫ কর্ডাইট রাইফেলের ('465 Cordite Rifle'র) চেয়ে ছোট কোন বন্দুকে তার শরীরে সামান্য মাত্র ক্ষত হয়, অনেক দিন ভুগে তবে মারা পরে। একটা পুরুষ বাইসনের শরীর হতে যে গুলি বার করে নেওয়া হয়েছিল তা তোমরা দেখেছ। কতদিন পূর্ব্বে এই মারাত্মক বস্তুটী যে তার দেহে প্রবেশলাভ করেছিল বলা কঠিন; তবে সে যে বহু পুরাতন ইতিহাস তাতে আর সন্দেহ নাই। এর উপর চর্ব্বি জমে মস্ত যে একটি আব হয়েছিল এটী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গুলিটী চামড়া ভেদ করে প্রায় দেড় ইঞ্চি পথ গিয়েছিল। তোমার গায়ে সূচের খোঁচা দিলে কিম্বা পিপড়ায় কামড়ালে যে টুকু ব্যথা বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ব্যথা তারও লাগে নি। আমার জন্যে Holland & Holland & Co. যে ·৫৭৭ কর্ডাইট রাইফেল ('577 Cordite Rifle) প্রস্তুত করেছে আশা করছি উহা গৌর শিকারেই আমার বিশেষ সহায়তা করবে। বন্দুকটীর চেহারা দেখলেই ভরসা হয়। আমার 12-Bore Royal Nitro Paradox একটী পুরুষ বাইসনের বিরুদ্ধে যেমন কার্য্যকর হয়েছে তা দেখে Holland & Holland & Co'র কর্ত্তা ত একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাইসন আমা হতে দশ বার পা দূরে ছিল। তখন গুলি চালান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ কাজটী উপযুক্ত স্থলে যোগ্য অস্ত্র ব্যবহারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ", শাস্ত্রের অনুশাসন বাক্যও রক্ষা করা হয় নি। শুধু ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিনিয়তে করেছিলাম। আর আমার আশাতীত সৌভাগ্যের গুণে তাতেই সুফল হয়েছিল। গুলি ঘাড়ে লাগায় সে তখনই মরে পড়ে গিয়েছিল।

১১ই জানুয়ারী ১৯১৮

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

অনেকগুলি সম্বরের মাথা আমাদের বাড়ীর দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করছে। এই হরিণের সঙ্গে যদিও তোমরা বিশেষভাবে পরিচিত তবু গৃহপ্রাচীরের বাহিরে দূরে তাদের জন্মভূমি আরণ্য প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা শোনা করিয়ে দিতে চাই। উন্নত সুগঠিত সুন্দর অবয়ব, ডাগর দুটী চোখ—সবল সুঠাম গতি ভঙ্গী—শাখাবিবিষ্ট বিস্তৃত শৃঙ্গাবলী! এই সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশে আরণ্য জীবের মধ্যে সে সুন্দর ও মহতের পদবী লাভ করেছে। সারা রাত বন ভ্রমণের পরে প্রাতঃকালে কোন পর্ব্বতে বিশ্রামের জন্যে সে যখন ফিরে আসে তখন তাকে দেখতে বড় চমৎকার মনে হয়। চকিত ভীত ভাব সকল জন্তুকেই বিশেষ একটী শ্রী দান করে, কিন্তু এ অবস্থায় আর কেউ হরিণের মত মনোহর হতে পারে না। তাদের বসতি, স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। শৃঙ্গ-শোভিত দুই একটী মস্তক লাভের জন্য পরিশ্রম করা সার্থক। এ সমস্ত সুন্দর জীব অধিক হত্যা করার পক্ষপাতী আমি নহি। যথার্থ মৃগয়ানুরক্ত ব্যক্তি কখন জহ্লাদ হতেই পারে না। এ জন্তুকে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে শিকার করায় কোন বাহাদুরি নাই। শীতকালে এরা জলে কাদায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে বড় ভালবাসে। সম্বর-অধ্যুষিত শৈল প্রদেশে গ্রামের বহির্ভাগে জলাশয় গুলিতে তাদের এই অভ্যাসের চিহ্ন সদা সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায়। একবার এমনি একটী জলাশয়ের পাশে বাঘের জন্য আমি আড় পেতে বসে আছি এমন সময় মনে হল মস্ত একটী জানোয়ার সাবধানে সেই দিকে আসছে। পদশব্দে বুঝলাম সে বাঘ নয়। তার জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার শব্দ কানে এল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটী সম্বর সেখানে পড়ে পঙ্কোৎসব করছে। এ পাশ হতে ও পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তার পর উঠে আবার এমনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিয়ে পড়ছে যে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম যে নালার পাথরে লেগে তার শিং জোড়াটা মর মর শব্দ করে উঠছে।

গারো পাহাড়ের নীচেকার ঘাস বনে গ্রীষ্মকালে যেন এদের মেলা বসে যায়। নাগপুর অঞ্চলে এদের জ্ঞাতি ভাইদের মস্তকের আয়তন আরো বৃহৎ। কেন যে এ প্রভেদ ঘটে আমি বলিতে অক্ষম। গাঢ় পাটকিলে রংএর হরিণ গুলি আয়তনে বৃহত্তর, কিন্তু তাদের শৃঙ্গযুগল তুলনায় লঘু। পাটল বর্ণের হরিণের আয়তন ক্ষুদ্র, অথচ তাদের শৃঙ্গ বৃহত্তর। এ বিভিন্নতার প্রকৃষ্ট কারণ যে কি আমি এখনও তা ভেবে ঠিক করতে পারি নি। আমি শুনেছি আরো এক বিশেষ জাতীয় সম্বর আছে। তার নাম গোসম্বর। এদের বসতি সম্বলপুর প্রদেশে। শীতকালে এদের দর্শন লাভ ঘটে। হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের মত বিভিন্ন শৃঙ্গই এই হরিণের বিশেষত্ব। এই প্রদেশের বনবিভাগের কর্ম্মচারীর কাছে শুনেছি এই গোসম্বর তিনি দেখেছেন। এই বিশেষ জীবটী প্রকৃতির কোন খামখেয়ালি, না কোন শিকারী সত্যই এই জাতিকে দেখেছেন, এ কথা আমি অনেকবার মনের মধ্যে তোলা পাড়া করেছি। আমার তো আজ পর্য্যন্ত এই বিশেষ জীবের নমুনা সংগ্রহ করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ সংবাদ যে অলীক নয় তার প্রমাণ এই যে সম্বলপুর প্রদেশে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানে আমার কাছে গোসম্বরের এই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন।

গোসম্বরের জীবনীশক্তি অসাধারণ, সহ্যশক্তিও আশ্চর্য্য। আহত হয়েও তারা অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। এক বাইসন ভিন্ন অন্য কোন জন্তুরই এ ক্ষমতা নেই। ঘাড় আর কাঁধের সন্ধিস্থলে

গুলি খেয়ে একটা হরিণ দশ গজের উপর এমনই দৌড়ে গিয়েছিল যে আমার বন্ধু জ— মনে করে-ছিলেন গুলি বুঝি মোটেই লাগে নি। তিনি প্রায় ত্রিশ গজ দূর হতে গুলি মেরেছিলেন। তাঁর বন্দুক ছিল 12 Bore Paradox। প্রথম গুলির শব্দে আমার মনে হল যেন পাথরের উপর গিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলিটী ঠিক লেগেছিল। আমি যা অনুমান করেছিলাম তা ঠিক। প্রথমটী তার শৃঙ্গযুগলে আঘাত করে, দ্বিতীয় গুলি কাঁধে লাগে! বাঘ কিম্বা চিতা যখন তাদের তাড়া করে যায় তখন বনের ঘন তরু শ্রেণীর মধ্য দিয়ে পলায়ন চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। শিঙ্ দুটী বাঁচিয়ে মাথা ফিরিয়ে যাবার কৌশল ও কোন কাজে লাগে না। গত বৎসর আশ্বিন মাসে যারা বন পিটোয় তাদের মধ্যে ভয়ে তাড়া-তাড়ি পালাবার চেষ্টায় একটি হরিণ এই অবস্থায় বিশেষ বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। বেচারা ভয়ে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। সোজা লাফ দিয়ে যাবার সময় গুঁড়ির গায়ে যেখানে দুটি ডাল দুধারে গিয়েছে সেই খানে তার শরীরটা আটকে গেল। ডালে আর গাছের গায়ে জড়ান ঘন লতায় তার দুটী শিং এমনি জড়িয়ে গেল কিছুতেই আর ছাড়াতে পারলে না। তার এই অসহায় অবস্থার দৃশ্য বড় শোচনীয় হয়েছিল। উদ্ধার করবারও কোন উপায় ছিল না। আমরা কাছে এসে পৌঁছিবার আগেই এক জন নির্দ্দয়ভাবে কুঠারের আঘাতে তার পা ভেঙ্গে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য অবিলম্বে তার সব যন্ত্রণার অব-সান করে দেওয়া হল।

আমার বিচারে সৌন্দর্য্য সম্ভায়, অনুপ ভূমির কড়া শিঙ্গা হরিণ (Swamp Deer)'কে দ্বিতীয় আসন দেওয়া যেতে পারে। সে আয়তনে সম্বরের চেয়ে ছোট, কিন্তু তার কাল ডোরা কাটা, ছোট ছোট সাদা গুলদান, হাল্কা পাটকিলে রঙের জামাটী বড় সুন্দর,—আলোয় জ্বল জ্বল করে! সে নাচু জমি আর জল বড় ভালবাসে। একা বাস করে না, সর্ব্বদাই দল বেঁধে থাকে। শিং দুটিতে অনেক সময় চৌদ্দটী পর্য্যন্ত ডাল দেখতে পাওয়া যায়। এমন এক জোড়া শিং অৰ্জ্জন-যোগ্য, বিশেষ আদরণীয়।

পিরানের বাহারের জন্যে যে হরিণের নাম চিতল, সে ঘন গুল্মসমাচ্ছন্ন অরণ্যের অধিবাসী; নির্ঝর-সংলগ্ন বন ভূমি ও অবারিত উপত্যকা-ক্ষেত্রের পক্ষপাতী। গুলদার জামা পরা এই সব সুন্দর সৌখিন জন্তু গুলি দলে দলে যখন সংকীর্ণ বন পথ দিয়ে মন্থর গতিতে জলে যায় কিম্বা বাঁশ বনের মধ্যে ছুটে চলে তখন বড় সুন্দর দেখায়। আবার যখন মুক্ত প্রান্তরে উদ্দাম দ্রুতগতিতে ছুটে চলে তখন হাতীর উপর বসে তাদের শিকার করে আমোদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভীতি-সঙ্কেত জানাতে এরা বিশেষ পটু। সম্প্রতি এদের এই সঙ্কেতের সহায়তায় আমরা এক জোড়া আহত ভালুকের সন্ধান করতে পেরে-ছিলাম। এ ছাড়া একটি আহত বাঘও আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে বন্ধুর পর্ব্বতপথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। চিতলের সঙ্কেত অনুসরণ করে আমরা তারও আশ্রয়স্থান আবিস্কার করেছিলাম।

মুণ্টজাক, সচরাচর যে Barking Deer নামে অভিহিত, সে দেখতে সুন্দর। স্বভাব কিছু ভীরু আর লাজুক, তাই একা একা থাকৃতে ভালবাসে। তার উপরের আধ খানা শরীর ঈষদারক্ত, উজ্জ্বল। দাড়ীর কাছটা পিঙ্গল রং, সাদা গায়ের উপর চারি দিকে ছড়ান সাদা সাদা ছাপ। সহসা যখন খুর খুর করে এদিকে ওদিকে ছুটে পালায় তখন তার হাল্কা চেহারাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গতিবিধির মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। তাকে দেখবার যখন সব চেয়ে কম প্রত্যাশা করা যায় তখনই সে এসে উপ-স্থিত হয়। শিং জোড়াটা এম্নি ছোট যে তা দিয়ে বেশ সুন্দর কলমদান হতে পারে। আমি একবার

শুধু কপাল জোরে হাতযশ লাভ করেছিলাম। একটা হরিণ প্রায় ৫০ গজ দূরে পাহাড় হতে নীচের দিকে ছুটে চলেছিল। গুলি করবার কোন মতলব আমার ছিল না। শিকারীটা আমাকে কখনো গুলি করতে দেখে নি। বড় জন্তু শিকারে নিয়ে যাবার আগে আমার তাকটা একবার পরখ করে দেখবে বলে বোধ হয় আমাকে ডেকে হরিণের খবর দিলে। তখন সে আরো গজ পনের দূরে গিয়ে পড়েছে। আমার ·450 কর্ডাইট বন্দুকের গুলিতে সে ছোট একটি খরগোসের মত টুপ করে পড়ে গেল। গুলির ঘায়ে তার গালটা ধারাল ক্ষুরে কেটে যাবার মত সোজা কেটে গিয়েছিল।

খোলা ঘাস জঙ্গলে "পারা" কিম্বা Hog Deer দেখতে পাওয়া যায়। শূয়োরের মত মাথা নীচু করে চলার অভ্যাস হতে এদের নাম Hog Deer হয়েছে। শর আর লম্বা কাসে ভরা বনের সংকীর্ণ পথে যেতে হলে মাথা নীচু করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বনের যে সব জায়গা আগুনে পুড়ে ফাঁকা হয়ে যায় সেখানে তারা চরে। তারা কচি কচি ঘাস খেতে ভালবাসে। এমি চটপটে যে শিকারীর হাতীর ঠিক শুঁড়ের নীচে হতে ছুটে পালাতে পারে। দুচারটে ভাল মাথা যোগাড় করবার ইচ্ছে থাকলে শিকারের সময় গুলি খুব সিধে চালান চাই।

মধ্যভারতে এক জাতীয় ছোট সুকুমার হরিণ দেখতে পাওয়া যায় তাদের নাম Mouse Deer। বন পিটবার সময় তারা হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কাছাকাছি ৮নং গুলিতেই মারা পড়ে। উঁচুতে সবে ১ ফুট। এ হরিণ না মারাই ভাল। চিনকারা কিম্বা Gazelle পাহাড়ী নালা কিম্বা উপত্যকায় বাস করে। তারা বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী নয়। মধ্যপ্রদেশে এদের বহুল বসতি। ছোট রাইফেলের গুলিতেই মারা পড়ে। তবে এদের শিকার করবার সব চেয়ে সদুপায় হচ্ছে রেঙ্গিতে চড়ে যাওয়া। রেঙ্গি হচ্ছে ত্রিকোণ ক্ষুদ্র শকট। আরোহী এবং চালক পিঠোপিঠি হয়ে বসতে হয়। বসবার জায়গায় অনেকটা বিচালি বিছিয়ে তার উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে নিলেই চলে। এই রেঙ্গি এক গাছে চড়া ছাড়া সব করে আর সর্ব্বত্র যায়; এমন কি সাঁতার দিতেও পারে।

চৌশিঙ্গা অথবা চতুঃশৃঙ্গ হরিণের দুজোড়া করে শিং আছে। তাই তাদের এই নাম। সম্মুখের শিং জোড়া পিছনের জোড়ার চেয়ে অনেকটা ছোট। এ জাতের হরিণ মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। ঘন বনসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতে আর গুল্ম বনে এদের বসতি। এরা ভারি লাজুক স্বভাবের। সহজে বনের বার হয় না, নয়ত বা এমন সময়ে আর এমন জায়গায় দেখা দেয় যেখানে তুমি তাকে দেখবার কোন প্রত্যাশাই কর নি। তখন আর তাকে শিকার করা চলে না। বন্দুকের গুলিটা তার চেয়ে আরো ভাল কারো জন্যে তুলে রাখতে হয়। নীলগাই হরিণকে কেন যে আমাদের দেশের লোকেরা গরু মনে করে তা বলতে পারি নে। বরং এদের আকৃতিতে ঘোড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী। এ জাতের হরিণের পুরুষদের গলার কাছে যে লম্বা দাড়ীর মত চুল আছে, তা দেখলে মনে হয় ঘোড়ার কাঁধের চুল; কেউ যেন ভুল করে লাগিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধিটা গরুর মতই স্থূল, তার চেয়ে বেশী নয়। কিছু দূর দৌড়ে পালায়, তার পরে ফিরে দেখে ব্যাপারটা কি। শরীরটা বেশ বড় তাই বেশী দূরে না থাকলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না। খোলা মাঠে বাস করতে ভাল বাসে। এই হরিণের ইস্পাতের রংয়ের চামড়া হতে বেশ সুন্দর হাত ব্যাগ তৈরি হতে পারে। এদের সংখ্যা আজও অনেক। যে সব বন বিশেষভাবে রক্ষিত সেখানেও এদের শিকার করা সম্বন্ধে কোন বারণ নাই।

হরিণ জাতীয় জন্তুদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে কৃষ্ণসার (Black Buck)। শুনেছি বেরার

চৌ ঙ্গা অথবা চতুঃশৃঙ্গ হরিণের দুজোড়া করে শিং আছে ৬৪ পৃষ্ঠা
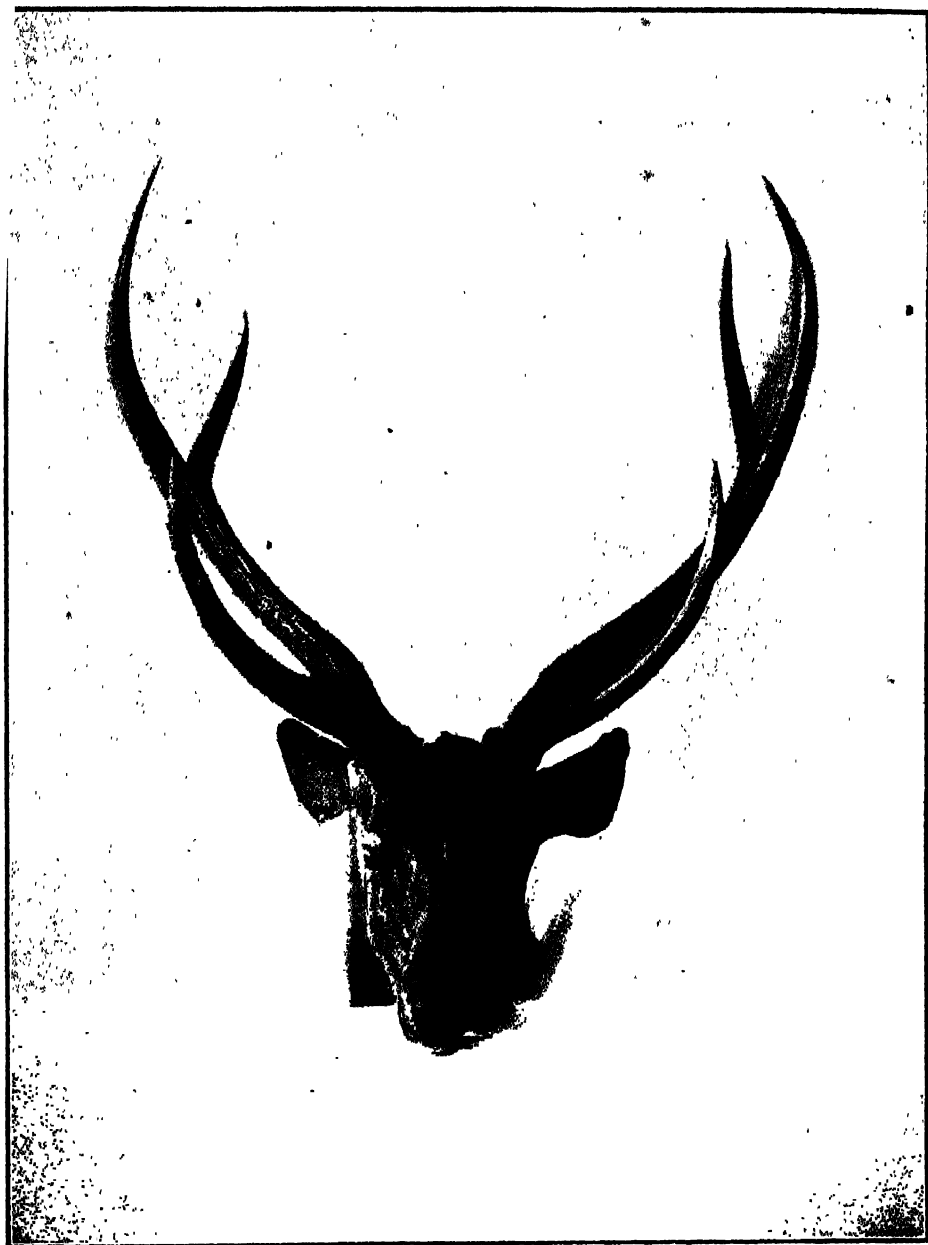
চৌশিঙ্গা বা চতুঃশৃঙ্গ হরিণ।—(৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রদেশে এই জাতীয় হরিণ অনেক পাওয়া যায়। গেল বড় দিনের ছুটীতে আমি যখন বনের মধ্যে একটা সৃষ্টি ছাড়া জায়গায় বাস করছিলাম তখন হরিণের দল আমার "রেঙ্গীর" সম্মুখে প্রায় একশ গজ দূরে আমাদের দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরে ধীরভাবে কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। প্রতি দলে বারটা করে হরিণ থাকে। প্রায় প্রতি দিন সকালেই আমার সুন্দর মাটীর বারান্দা হতে দেখতে পেতাম, এই সুশ্রী হরিণের দল কোন চাষার তাড়া খেয়ে খুব কাছ দিয়েই ছুটে পালাচ্ছে। কাছাকাছি দু তিন পাল হরিণ ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এদের মধ্যে ভাতৃভাব বড় একটা দেখি নি। দূরে দূরেই থাকত। এখানে স্থানীয় ভাষায় হরিণের পালকে "গোল" বলে—ঐ গণ্ড "গোলের" ভয়েই হয়ত ভাই ভাই ঠাঁই, ঠাঁই হয়ে থাকে।

ভ্রাতৃভাবের কথা বলতে গিয়ে একটা পুরান গল্প মনে পড়ে গেল। স্বগতোক্তি স্বরূপে সে কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা "আশী কেলে বাসী কথা"। সে সময় একজন পার্লামেণ্ট সভার মেম্বার (M. P.) সপরিবারে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। শিবপুরে বোটানিকেল গার্ডেনে (Botanical Garden'এ) নিমন্ত্রণ করে তাঁদের অতিথিসৎকার করা হয়েছিল। ইনি এই জাতীয় অনেকেরই মত এদেশে আগমন এবং বাসকালের সদ্ব্যয় করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ধাতু গলাবার পাত্রবিশেষ আবিষ্কার করে এই ব্যক্তি বহুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়ায় আমার স্বদেশীয় বন্ধুরাও অল্প সময়ের মধ্যে তাৎকালীন রাজনৈতিক সমস্ত সমস্যা এবং তাহার সমাধানের উপায় তাঁর উৎসুক কর্ণকুহরে ঢেলে দিতে ব্যস্ত হন। ইনি কথা কমই বলেছিলেন। সম্ভবতঃ বুঝেছিলেন আরও অল্প। পাটিসাপ্টা পিটের পুরের মত ডজন খানেক উৎসাহী স্বদেশভক্তের মধ্যে ঠাসা হয়ে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। দুই এক কথা আমার কাণে এসে পৌঁছছিল,—যথা—"Home Charges", "Separation of the Judicial from the Executive," "More Members of Council", ইত্যাদি। Home Rule'র ধুয়া তখনও ওঠেনি। কাণেখাট লোকের মত তিনি কখন, "তাই ত," "সত্যি নাকি," এই সব বলছিলেন। শ্রীমতী এবং কুমারী M. P.'র আমার সঙ্গে সময় আরও ভাল কাটছিল। ভারতবর্ষবাসে সর্পভয়, ব্যাঘ্রভয়, জ্বরবিভীষিকা, আরও শত সহস্র অশুভ আশঙ্কাবশতঃ দুই দেশের মধ্যে যে সাত সমুদ্র তের নদী ব্যবধান তার অপর পারে তাঁদের পক্ষে বসবাস করাই যে শ্রেয়ঃতর এবং শ্রেয়স্কর, এই কথারই আমি বিশদ ব্যাখ্যা করছিলাম। কোন একজনের জুতার মধ্যে বিষাক্ত সরীসৃপ আবিষ্কারের ভীষণ দৃশ্য উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণনা করতে করতে আমরা একটী জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হলাম। এই পুষ্করিণীতে অনেকগুলি রাজহংস বাস করত। তাদের মধ্যে কতকগুলি সাদা আর কতকগুলি কাল। তখন তারা সবাই মিলে প্রসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। আমি এদের দিকে M. P. মহোদয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলাম,—এই বিভিন্ন বর্ণের রাজহংসের মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যের কোন তারতম্য দেখতে পাচ্ছেন কি না?

M. P.—না তা ত দেখছিনে; উভয়েই বড় সুন্দর।

আমি—লক্ষ্য করছেন কি এই দুই দল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে রয়েছে,—আদপেই মিলামিশা করছে না?

M. P.—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত, ভারি আশ্চর্য্যের কথা।

আমি—এর মধ্যেই ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার সমস্ত ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

এতক্ষণ ধরে তাঁ'র শ্রবণবিবরে যত কিছু হেঁয়ালি প্রবেশ করে জটিল অনির্দ্দিষ্ট আকারে ক্রমশঃ আরও কুটিল হয়ে উঠছিল, হঠাৎ আমার এই একমাত্র কথায় সরল সুপথ ধরে বেরিয়ে এসে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। M. P. মহাশয়ের রাজনৈতিক শিক্ষার এমন সত্বর সমাপ্তি দেখে বন্ধুগণ আমার হঠকারিতার জন্যে সরস মাতৃভাষায় আমাকে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা শুনিয়ে দিলেন। শ্রীমতী M. P. আমাকে সাদায় কালোয় মিলামেশা ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আমিও নির্দ্দোষ সরল ভাবে উত্তর করলাম;—এর ফলে মিশ্র বিচিত্র বর্ণের ও সঙ্কর জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়।

প্রকৃতির বর্ণ ভাণ্ডারে শ্বেত কৃষ্ণ এই দুই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরুষজন্তুর বর্ণ ও বেশ ভূষা কেন যে অধিকতর উজ্জ্বল ও দৃষ্টিআকর্ষক হয় ইহার অর্থ খুব সম্ভবতঃ এই যে প্রকৃতির ইচ্ছা নয় এদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি লাভ করে। প্রায় দেখতে পাওয়া যায় স্ত্রীজন্তুর গায়ের বর্ণ তাদের আবাসভূমির চারি দিকের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করছে। এতে করে তারা সহজে অপরের চোখে পড়ে না;—শিকারী এবং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। বৃদ্ধা হরিণীরা সাধারণতঃ প্রহরীর কাজ করে। হরিণগুলি যে সময় লড়াই কিম্বা খেলা নিয়ে ব্যস্ত তখনই তাদের একজন শত্রুর আগমনের প্রথম সংবাদ জানায়। আমার একটী হরিণের মাথা আছে তার একটী শিং ঠিক মাঝখানে ভাঙ্গা। এটা তার বিজয়চিহ্ন, যদিও অক্ষত শরীরে নয়! এই লাজুক ভীরু জন্তুগুলির নিকটবর্ত্তী হতে হ'লে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং "অলমতি বিস্তরেণ!"

আমি একবার একটী হরিণ গুলি করবার পর সমস্ত হরিণের পাল লাফাতে লাফাতে দৌড়ে আমার সম্মুখে এসে পড়ল। গুলি করবার বাদ্য আর কোন হরিণ তাদের মধ্যে নেই দেখে যখন তারা আমার খুব কাছে এসে পড়ল তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার দুই দিকে ডাইনে ও বাঁয়ে বিভক্ত হয়ে যখন তারা ছ ফুট ব্যবধানে দৌড়ে চলে গেল তখন দৃশ্যটী বড় চমৎকার হয়েছিল। গুলির শব্দে চমকে উঠে দলের প্রাপ্তবয়স্কা হরিণীগুলি সোজা অনেক দূর পর্য্যন্ত লাফ দিয়ে উঠেছিল। উদ্দেশ্য যে উচু মাটীর আলের আড়ালে আর কোথাও কোন শত্রু অলক্ষিতে আছে কি না তাই দেখা। কেন না এই আড়ালের সুবিধা নিয়েই আমি তাদের অত কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

আমার শেষ কথাগুলি তোমাদের সতর্ক করবার জন্য বলছি। এ উপদেশ কখনও ভুল না। খোলা মাঠে গুলি চালান বড় বিপজ্জনক। তাই এ কাজ করবার আগে একবার তোমার field-glass দিয়ে চারি দিকটা বেশ ভাল করে দেখে নিও। এই সৎপরামর্শের অবহেলা বশতঃ অনেকবার অনেক জায়গায় অনেকের বিপদ ঘটেছে। আমার মনে হয় নিজেকে এমন দুরবস্থার মধ্যে ফেলার চেয়ে শিকারের সমস্ত সুযোগ ত্যাগ করাও ভাল। বিপদ যদিবা নাও ঘটে, হয়ত এমন কিছু ঘটতে পারে যার জন্য চিরকাল ধরে অনুশোচনা ও অনুতাপ করতে হয়।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

আরণ্য বিদ্যায় দক্ষ অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য ও শিক্ষা ব্যতীত হাতে কলমে বনের মধ্যে জন্তুকে সন্ধান করে আবিষ্কার করবার বিদ্যা কোন রকমে লাভ হতেই পারে না। মানুষকে উড়তে শেখান যেমন অসম্ভব এও তার চেয়ে কিছু কম নয়। সৌখিন ভাবে কঠোর বিদ্যা লাভ হয় না। প্রথমতঃ, যে জন্তু শিকার করতে যাবে তার অভ্যাস, স্বভাব, গতিবিধির সম্বন্ধে তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। শুধু তাই নয়। বনের ও পর্ব্বতের অন্যান্য পশুদের, এমন কি পাখীদের, সম্বন্ধেও এ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু যে বাঘ আর চিতাবাঘ নিশাচর তা নয়। যাদের শিকার করে এরা জীবন ধারণ করে সে সব জন্তুও নিশাচর। ভাল বাইসনও এই প্রকৃতির জীব। এই সব ভীষণ হিংস্র জন্তুদের পায়ে হেঁটে নির্ব্বিঘ্নে শিকার করতে হলে এদের সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তা অর্জ্জন করবার মত উৎসাহ, উদ্যম ও তৎপরতা খুব কম লোকেরই দেখা যায়। যা কিছু একান্ত আবশ্যক অপরে করে। যেমন জন্তুর অন্বেষণ, সন্ধান, শিকারীর সংস্থান, আহত জন্তুর নির্ব্বিচার অনুসরণ— অধিকাংশ স্থলেই যার পরিণামে বিপদ ঘটে। কাজেই হাতীর পিঠে না ত মাচানে চড়ে ছাড়া পায়ে হেঁটে শিকার, বিশেষতঃ হিংস্র জন্তু শিকারের ব্যাপারটা, নিতান্ত নির্ব্বোধ গোঁয়ারের কাজ বলে গণ্য হয়েছে।

সদাসর্ব্বদা সতর্ক বুদ্ধিমান সাহসী "গাইডের" সঙ্গে বনের মধ্যে যাওয়া আসা করতে করতে আরণ্য জন্তুদের রীতি চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হলেও আমার পরামর্শ এ সব সময়ে বন্দুক ছাড়া হয়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়। তবুও বনে পর্য্যটন জ্ঞানার্জ্জন চেষ্টায় যখন ফিরবে তখন গুলি করবার প্রলোভনটা সম্বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঝোপঝাপ বেতবন প্রান্তরের ঘন বন শ্রেণী এই জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিশেষ অন্তরায়। ব্যবধান বশতঃ অতি অল্প দূরেও কিছু দেখা যায় না। যখন এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়েছে তখনও বনের সংকীর্ণ পথে যাওয়া আসা করতে হলে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হয়ে চলা উচিত; কেন না এই সব জায়গাতেই ভীষণ হিংস্র জন্তু লুকিয়ে বসে থাকে। আমার পুরান "গাইড"রা এমন সব জায়গায় যেতে হলে প্রথমে চিৎকার ধ্বনি করে পরে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে দেখে কোন সাড়া পাওয়া গেল কি না। তার পরে এগোয়। এই শব্দটুকু জন্তুটাকে অগ্রসর কিম্বা পশ্চাৎপদ করবার পক্ষে যথেষ্ট। এই উপায়ে তোমার শ্বাপদ জন্তু হতে ভল্লুক, হরিণ, শূকর ও নকুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর গতির পার্থক্য বুঝবার সুযোগ ঘটে। রাত্রি যখন সমাগত, কুলায় প্রত্যাগত পাখীদের কলরব নিস্তব্ধ, এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব হতেই বাঘ, চিতা কিম্বা হরিণ নিশা ভ্রমণে নির্গত হবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাদের দিবা নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। এই সময়ে কিম্বা উষা কালে হরিণ ও শূকর রাত্রি ভ্রমণ সমাধা করে যখন আপন আপন দিনের আশ্রয়ে ফিরে আসছে সেই সময়ে বাঘ আর চিতা তাদের শিকারের সুযোগ খোঁজে। ঘন ঝোপের মধ্যে অনেক জন্তুর বারম্বার গতিবিধির ফলে সেখানে সংকীর্ণ পথের সৃষ্টি হয়। যে পথে বাধা অল্প স্বভাবতঃই বনচর পশুরা সেই পথ ধরে চলে। আবার পর্ব্বতসংলগ্ন বনে জন্তুরা সব চেয়ে নিরাপদ নিম্নগামী পথের পথিক হইতে প্রায়ই দেখা যায়। শৈল নির্ঝরিণী যে প্রান্তরে নেমে আসে এরাও সেই পথের অনুসরণ করে। সদাসর্ব্বদা গতিবিধির ফলে সংকীর্ণ

গলি ক্রমে রাজপথে পরিণত হয়। এ সব পথের এক দিকে খাড়া পাহাড় অন্ত দিকে গভীর জলাশয়, কিম্বা হয়ত দুই দিকেই সোজা পাহাড় প্রাচীরের মত উঁচু হয়ে থাকে। কাজেই এ সব বাধা এড়িয়ে খাটো পথে নীচে নালায় কিম্বা মাঠে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। জন্তুমাত্রেই স্বভাবতঃ এমন সব বাধা ব্যবধান বোঝে, আর পাশ কাটিয়ে চলে। বুদ্ধিমান শিকারীর সতর্ক সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে সহজেই ইহা ধরা পড়ে। রাতে অন্ধকারের সুবিধা পেয়ে বাঘ (চিতাবাঘ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে) খোলা পথে যায়, কিন্তু দিনের আলোকে অন্ধকার গলি ঘুঁজি দিয়েই চুপি চুপি যেতে ভালবাসে। তবে যদি তাড়া খেয়ে বিশেষ বিপদে কোন খোলা পথে এসে পড়ে তবে যত সত্বর সম্ভব সে পথ অতিক্রম করে যেতে পারলে বাঁচে। সাধারণতঃ, সোজা পথ এবং খোলা জায়গা এড়িয়ে চলে। নিশাভ্রমণ কালে তারা "খুঙ্কি পথ" আর গরুর গাড়ীর রাস্তা ধরেই যায়, কেন না তাঁদের জানা আছে এ পথে গেলে জলা ভূমি কিম্বা জলাশয়ের বাধা অতিক্রম করতে হবে না, কোন বিপদে পড়তে হবে না। আমি একবার দেখেছি বাঘ গরুর গাড়ীর রাস্তা ছেড়ে সোজা পথে গন্ধে গন্ধে একটা মহিষের সন্ধানে গিয়ে পৌঁছেছিল। মহিষটা বনের মধ্যে দূরে একেবারে চোখের আড়ালে প্রায় দুশ গজ দূরে বাঁধা ছিল। এদের ঘ্রাণ শক্তি এমনই তীক্ষ্ণ! নালার বালুকা হতে তার পায়ের চাপে জল তখনও আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছিল। অতি ছোট অন্যান্য পায়ের দাগের আশ পাশ ভেঙ্গে গিয়েছে, সে গুলি তখনও ভিজে রয়েছে। যে সব গাছের গা ঘেঁসে গিয়েছে, নাড়া পেয়ে তা থেকে শিশির মাটীতে ঝরে পড়েছে। তার পরে কোন শিশির ডাল পালায় আর পড়েনি। যে পথে মোষটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেখানকার ডাল আর পাতার উপরে কাদার দাগ তখনও কাঁচা। এ সব হতে স্পষ্ট বোঝা গেল হত্যাকাণ্ডটা দিনের আলোতেই সমাধা হয়েছিল। এই বড় রাস্তার পাশে, জলের ধারে, ঝোপ কিম্বা বেত বনের প্রবেশ ও নির্গম পথে ব্যাঘ্র পদচিহ্নের সন্ধান করতে হয় —আর এই চিহ্ন হতে আবিষ্কার করতে হয় যে তারা ঘরে ফিরেছে না চরতে গেছে। এই চরণচিহ্ন অনেক সময় বহু দূরে দূরে দেখতে পাওয়া যায়, একটির সঙ্গে আবার অন্যটীর সঙ্গতি আবিষ্কার করাই আরণ্য বিদ্যার পরিচয়। কোথাও হয়ত দেখবে একখণ্ড পাথর কিম্বা গুটি কত পাতা উল্টে পড়ে আছে। কোথাও বা গুরু পদ ভারে ক্ষীণ তরু শাখা, সুকুমার লতা দলিত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিকের মত সময়ের গণনাও ঠিক রাখতে হয়, কেননা প্রতি প্রহরেই পরিবর্ত্তন ঘটে, ধুলো উড়ে পড়ে চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়ে যায়; আর্দ্র স্থানে দিবসাতীত ঘটনা অমনোযোগী পরিদর্শকের চক্ষে প্রহর পূর্ব্বেকার বলে প্রতিভাত হয়। গবাদি জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু প্রস্তর কিম্বা শুষ্ক পত্রের উপর খুরের যে চিহ্ন রেখে যায়, শ্বাপদের বালিসের মত নরম পায়ের দাগ তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বেলা করে ঘরে ফিরিবার পথে শ্বাপদ যে পদচিহ্ন রেখে যায়, শিকারের সন্ধানে রাত্রে যখন অভিযান করে তা হতে স্বতন্ত্র। যখন তুমি এই সব পাদলিপি কতকটা নির্ভুল ভাবে পড়তে পারবে তখন তোমার পক্ষে তাদের গতিবিধি, আশ্রয়স্থান, হঠাৎ তাড়া খেয়ে লুকাবার জায়গা, এক পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন, ইত্যাদি ব্যাপার অনুমান করা কঠিন হবে না। কোথায় কোন গাছ কিম্বা কেমন পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্য করলে কৃতকার্য্য হবে; জন্তু আহত হলে তোমায় সহসা আক্রমণ করতে পারবে না, এ সব কঠিন কথা সহজেই বুঝতে পারবে। দাঁড়িয়েই থাক কি আসনপিঁড়ি হয়ে বসেই থাক, তোমাকে কিন্তু আসনসিদ্ধ যোগীর মত স্থির নিশ্চল

হয়ে থাকা শিখ্‌তে হবে। অতি সামান্য নড়াচড়া করলেও তুমি ধরা পড়ে যাবে, হয়ত আক্রান্ত হবে, নয়ত নিঃসন্দেহে সেবারের মত শিকারের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা হারাবে। যে সব পাখী মাটীতে বাসা বেঁধে বাস করে, কোন জন্তু নিতান্ত নিকটে না এলে তারা আপন বাসা ছাড়ে না, ছাড়লেও বেশী দূরে উড়ে পালায় না। জন্তুটী যাতে করে তার বাসার সন্ধান জান্‌তে না পারে সেই অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে অল্প দূরে উড়ে চলে যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কয়েকবার এই রকম পাখী আমায় বাঘের আসন্ন-আগমন জানিয়ে দিয়েছিল। বন ঘেরাও করে যে সকল লোকজন আসছিল তারা তখনও দূরে ছিল বলে, পাখীটীর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেশী দূরে উড়ে পালাবার আবশ্যক হয় নি। বানরের দলও অনবরত গোলমাল করে, কার্য্যতঃ বাঘ সম্মুখে তাড়িয়ে আনবার সাহায্য করে, তোমাকেও আগে হতেই তার আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেয়। অনেক সময় বরাহঅবতারের অকারণ স্পর্দ্ধাপূর্ণ ফুংকার, বনের রঙ্গ-ভূমিতে ব্যাঘ্রবীরের প্রবেশের প্রস্তাবনা জ্ঞাপন করে। এই সেদিনে বৃহৎ এক ভল্লুকদম্পতি তাড়া খেয়ে একই ঘাটে নেমেছিল, কিন্তু তারা একটা ব্যাঘ্র পরিবারের (বাঘ, বাঘিনী আর পূর্ণবয়স্ক পুত্রের) কিছু পিছনে পড়ে ছিল। যেমনি এদের দেখা, অভ্যস্থ পথ ছেড়ে পাহাড়ের খাড়াই পথ দিয়ে ভয়ে চীৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তাদের ব্যবহারেই ব্যাপার-খানা আমি সহজেই অনুমান করতে পারলুম। পরে ঘটনা পরম্পরায় সে অনুমান যে অভ্রান্ত তাও প্রমাণ হয় গেল।

শীতকালে পাহাড়ের জঙ্গলে চোরকাঁটা এক বিষম উপদ্রব। এই কালো কালো কাঁটা বাঘ কিম্বা চিতাবাঘের শীতকালের পুরু কোটে আটকে যায়। চামড়ার পট্টি না পরে মোজা যদি পর, তবে তোমারও এ দশা হয়। বন পিটোবার সময় চোর কাঁটা ভরা জমি বাদ দিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, কেন না কোন জন্তু পারত পক্ষে সে রাস্তা মাড়ায় না। একবার একটা বাঘ গরু মেরে তাকে নালা দিয়ে টেনে পাড়ের পাশে চোর কাঁটা ভরা এমনি একটা জমিতে গাছের নিচে নিয়ে গিয়েছিল। বেশী দূর পর্য্যন্ত কিন্তু যায়নি, আর যেখানে চোর কাঁটা কাটা হয়েছিল, সেই পরিষ্কার জায়গা টুকুতে তাকে মুখে করে লাফ দিয়ে যাবার আগে অল্পক্ষণের জন্য রেখেছিল। দুই এক গ্রাস মাংস খাবার আগে দেখলাম সে সাবধানে চারিদিকের ঘাস পায়ের চাপে বেশ ভাল করে সরিয়ে দিয়েছে। তার জাতীয় স্বভাব বশতঃ সে যে কোন্ পথে ফিরবে 'তা' অনুমান করা কঠিন হয় নি। চোর কাঁটা যে তার গতিবিধির সাক্ষ্য দিবে সে উপায় সে রাখেনি।

তোমরা জান ফেউ বাঘের পিছু পিছু চলে, কিন্তু সব জায়গায় এ কথা ঠিক নয়। এ ডাক শুধু ভয়ের ডাক। আমি একবার দিনের ভরা আলোতে একটী শৃগালকে পিছনের পায়ে উবু হয়ে বসে আমাদের মোহনলাল হাতীকে দেখে এই ভাবে চীৎকার করে গলাভাঙ্গতে শুনেছি। নিরীহ মোহনলাল কিন্তু একান্ত মনে কিছু দূরে সুস্থ স্বচ্ছন্দ চিত্তে কলাগাছের কচি থোড় ভক্ষণে নিযুক্ত ছিল, শৃগাল চন্দ্রের কোন হানি সে করেনি। মাহুতও হাতীর উপর ছিল না, আর আমি প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু যদি দেখ বনের ধাওড় জাতীয় এই জন্তু দুচার জন একত্র হয়ে জঙ্গলের আনাচে কানাচে

কেবলই ঘুরছে, আর থেকে থেকে ফেউ ডাকছে—তাহলে বুঝবে এর কোন হেতু নিশ্চয়ই আছে—আর সেই সময় যদি তুমি জঙ্গলটা পিটিয়া দেখ তাহলে বুঝবে কাজটা ভুল হয় নি। তার এ পরিশ্রমের পুরস্কার নগদ আদায় হয়ে আসবে এ কথা নিঃসন্দেহ।

এ প্রসঙ্গে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। জন্তুর অনুসন্ধান কাজ বিজ্ঞানবিশেষ; অমানুষিক ধৈর্য্য, অশ্রান্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলেই আয়ত্তসাধ্য। এ বিদ্যা অর্জ্জনের বিশেষ ও অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ মনোযোগ, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত, জাগ্রত সচেতন মন, বুদ্ধি বিবেচনা। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে মনের এই সতর্কতা বৃদ্ধির কোন উপায় করা হয় না। ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে শিক্ষকের নিকট হতে কোনরূপ সাহায্য কিম্বা উৎসাহ লাভ করে না। আমার মতে যে নিপুণ অধ্যাপক মশক, Snipe এবং হস্তী জাতীয় জীবের প্রভেদ আবিষ্কার করতে পারেন না তাঁকে অধ্যাপনার ভার দেওয়া কখনই উচিত নয়। উপরোক্ত তিনটি জীবেরই অযথা দীর্ঘ নাসিকাগ্রভাগ, চঞ্চু এবং শুণ্ড আছে। আর চার্লস ল্যাম্বের অননুকরণীয় ভাষায় বলতে গেলে তিনটি জীবই অধ্যাপকদের মত পালকের কলমের সাহায্যে জীবনী রস শোষণ করে থাকেন। অযথা হলেও শেষোক্ত প্রাণীগণের এ বিষয়ে তৎপরতা সমধিক।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৮

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

তোমাদের কাছে এখন আমার দুটী মৃগয়া যাত্রার বর্ণনা এখানে দেব। একটী দূর শৈল প্রদেশে, অপরটী সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির সমতল প্রদেশে,—আমাদের দেশের বাড়ীর নিকটে। আশা করি এ কথা তোমাদের ভাল লাগবে। অতীতের পুরুষোচিত সাহসিক কাজের স্মরণ, আর ভবিষ্যতে তার আশা ও কল্পনা দুই সমান আনন্দজনক। পার্ব্বত্য প্রদেশে আর সমতল প্রান্তরের অভিনীত দৃশ্যাবলীর সুখ স্মৃতির মধ্যে বার বার ফিরে ফিরে যেতে মন ভালবসে। আশায় যখন নিরাশা আসে, ভাগ্যে বিঘ্ন বিপদ যখন ঘটে, কষ্ট অসুবিধা যখন ভোগ করতে হয়, এ সব সেই সময়ের জন্যই বিরক্তিকর। ভেবে দেখতে গেলে এই সমস্ত দুর্ঘটনার দুঃখ, বিলাসসম্ভোগের সুখের মতই অকিঞ্চিৎকর। বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত শরীরে কোন ক্রমে তাঁবুতে ফিরে দেখ তৈজস পত্র সব কি যে কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই, রাতের অন্ধকারে অফুরন্ত পথে হাতীর উপর আরোহী হয়ে গজেন্দ্র গমনে জলা ভূমি আর জঙ্গলে পথ ভুলে ঘুরে মরে, অসময়ে ফিরে আস; শিকার যদি তুমি সত্যি ভালবাস তা হলে এ সব অসুবিধা দুঃখ বলে মনেই হয় না। গৃহের আরাম ও আনন্দের মধ্যে ফিরে, বনবাস দুঃখ ক'দিন বা আর মনে থাকে। সহরের ইট কাট, পাষাণ পথ দুদিনেই মনে শ্রান্তি নিয়ে আসে। আবার সেই বনপথ, খোলা মাঠের খোলা হাওয়া, বনানীর শ্যামাঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়ার জন্য মন উতলা হয়ে উঠে। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রাজপথের দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই নির্ম্মল শুদ্ধান্তঃ শোভা উপভোগের পরম সুখ কিম্বা চরম দুঃখের জন্যে অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়। প্রকৃতির অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ করতে পারলে

যে আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায়, আধুনিক সভ্যজীবনে সে আনন্দ নিতান্ত দুর্লভ। আজ কালকার এই কাজ আর আমোদের স্রোতে পড়ে মানুষ মনোযোগ দেবার, অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করবার, দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই দূষিত কুৎসিৎ নগরীর বাহিরে না গেলে, আকাশের চন্দ্র তারা গ্রহ নক্ষত্র যথার্থই যে আমাদের বন্ধু এ কথা জানবার সুবিধা হয় না। এখানকার এই গ্যাসের আলো আর বিজলীবাতি আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি হতে তাদের অন্তরাল করে রাখে। কালপুরুষ আকাশের কোন স্থানে আছে তাই দেখেই রাত্রের কত প্রহর অতীত হল কিম্বা কত প্রহর বাকী, সে কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। চন্দ্রমার ষোড়শ কলা, আকাশ পথে তার গতি, তার বঙ্কিম বিচিত্র আকার, উদয়াস্ত কালের সঙ্গে কি আশ্চর্য্য সাম্য রক্ষা করে! সে রহস্য কথা তোমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে স্বতই অবারিত হয়ে যায়। যে অভীষ্ট লাভের জন্য তুমি বনবাস বরণ কর, তার সাধনায় দিনের পর দিন, প্রকৃতির খোলা বইএর পাতাগুলি তুমি অনবরত পড়তে পাও, আর পশু পক্ষী, গ্রহনক্ষত্র, পর্ব্বতপাদপ সকলেরই কাছ হতে অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন হয়। "How dull it is to pause, to make an End, To rust, unburnished, not to Shine in use! As tho' to breathe were life."

রেল পথে শ্রান্তিকর ভ্রমণের পরে, অতীতপ্রায় রাত্রির অতি অল্প অবশিষ্ট কাল বিশ্রাম করে, আমরা বর্ত্তমান যুগের বায়ুরথারোহণে যাত্রা করলাম। বিরল পথে হুহু শব্দে একখানি হাওয়া গাড়ী ছুটে চলেছে দেখতে সবারই ভাল লাগে। পল্লীর মধ্য হতে ছোট ছেলে মেয়েরা পথের দুধারে ভিড় করে দাঁড়াল, তরুণীরা এলোচুলে ঘরের দুয়ারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মাথার ঘোমটা যে খসে পড়েছে সে সম্বন্ধে কোন হুঁস্ই ছিল না। বোকার মত ব্যবহার করল শুধু দল ছাড়া গরুগুলো। আমাদের পথে হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়, আর যতক্ষণে রাখাল এসে তাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের সদ্গতি আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠে ভাল করে লাঠির ব্যবস্থা না করে ততক্ষণে আর নড়ে না। রাখালের আর তাদের ভাষা এক না হলেও গালাগালি বুঝতে কোন গোলই হলনা দেখলাম। অনেক বৎসর আগে আমার বিলাত প্রবাস কালে উইল্টসায়ারে (Wiltshire'এ) আমি এক বন্ধুর সঙ্গে শিকার করছিলাম। একদিন সকালে বন্ধুর দুই জার্ম্মান সৈনিক অতিথি এল। হঠাৎ দেখলাম বন্ধু বনের আশ্রয় ছেড়ে খোলা পথ দিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাঁর কাছে গেলে বল্লেন ভাই তুমি ফিরে যাও, হতভাগা জর্ম্মান গুলো বেপরোয়া পাখী না মেরে আমার দিকে কেবলই গুলি করছিল। আমি বনের আশ্রয়ে না ফিরে অপরাধীদের দিকেই চীৎকার করতে করতে দৌড়ে গেলাম। উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিনে দেখে, আমি ইংরাজী ছেড়ে বাঙ্গালা ভাষার বাছা বাছা যত গালাগালি জানা ছিল সব দিলাম। দেখলাম অসুধ ধরেছে, আমার মনোগত ভাব তারা বুঝেছে। তার পর হতে তাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়ে গেল বটে কিন্তু বন্দুকের নিশানা তেমনই বিশ্রী রয়ে গেল।

ঘণ্টা খানেক অতি সুন্দর পথে মোটর গাড়ীতে যেন উড়ে চললাম। তার পরে সৌখিন যান বাহনের কাছে বিদায় নিতে হল। হাতীর পিঠে যদি গদি বাঁধা না থাকে তা হলে বেশী দূর যাওয়া কষ্টকর, অথচ এমন সব পথে এর চেয়ে ভাল বাহন আর অল্পই আছে। নদী নালা খানা খন্দ পেরিয়ে পাহাড়ের পথে গজেন্দ্র গমনে কোনরূপে অগ্রসর হতে লাগলাম। স্থানে স্থানে গতি বিধি আশাতীত দুষ্কর হয়েছিল। পাহাড়ের পাড় একেবারে খাড়া, তাতে আবার অনেকগুলি বাঁশঝাড়

এক দল লোক এই সব ঝোপ ঝাড় কেটে বাধা দূর করে পথ সুগম ও পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। আলগা বড় বড় পাথরে অসমান ধারাল পর্ব্বত গাত্রের উপর দিয়ে হাতী কোন ক্রমে পথ করে চল্‌ছিল। কখনো হাঁটু গেড়ে গুড়ি মেরে যাচ্ছিল কখনো বা গাছের ডাল শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে কায় ক্লেশে আপনাকে উপরে টেনে তুলছিল। সব চেয়ে দুর্গম পথটা তখনো সম্মুখে। সেটি একটী পর্ব্বত সঙ্কট, সঙ্কীর্ণ পথ, এক ধারে উঁচু প্রাচীরের মত খাড়া পাহাড়, অন্য ধারে ৬০০ ফুট গভীর খাত। সেখানে তরঙ্গসঙ্কুল উদ্দাম উন্মত্তগতি গিরি নদী গদ্গদ শব্দে বয়ে চলেছে। বেদিচত্বরের মত যে অপ্রশস্ত পথে আমরা চলেছি তার বিস্তার তিনফুটের অধিক নয়, এই পথের অনেক অতীত ঘটনার কথা মাহুত আমাদের শোনাচ্ছিল। একবার এইখানটিতে একটী বাঘ ও একটী হরিণের মুখো মুখি দেখা হয়েছিল (আমার Browning'এর Donald'এর কথা মনে পড়ছিল) তার পর হরিণটী এক লম্ফে একেবারে অনন্তের পথের যাত্রী হয়েছিল। আর একবার একটী বুনো হাতী পা ফসকে আবর্ত্ত বিভ্রমময়ী গিরিনদীর বুকের উপর গিয়ে পড়েছিল। সেখানে কোন আশ্রয় না পেয়ে ভেসেই চলেছিল। সেও অনন্তের কূলে পৌঁছিত বোধ হয় দৈবাৎ যদি না তটবর্ত্তী মহীরুহ প্রসারিত শাখা বাহুর সাহায্যে তার প্রাণ রক্ষা করত। এই সব অতীত কাহিনী আমাদের মনে কতদুর উৎসাহ সঞ্চার করছিল সে কথা ব্যক্ত করে না বল্লেও কল্পনার সাহায্যে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হবে সন্দেহ নাই। মাহুত আমাদের কানে মাভৈঃ মন্ত্র দেওয়া সত্বেও বনবিভাগের কর্ম্মচারীর পরামর্শমত আমরা রাজোচিত বাহন ত্যাগ করে সে পথটুকু পদব্রজে পার হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করেছিলাম। পাহাড়ের পথের আলগা পাথর সর্ব্বত্র নিরাপদ ছিল না। হাতী কিন্তু এতটুকুও চঞ্চল না হয়ে পথটা অতিক্রম করে এল; কেবল আত্মরক্ষার জন্যে সাবধানী লোকের মত পর্ব্বত প্রাচীরে নির্ভর করে ধীরে সতর্ক ভাবে প্রতি পদক্ষেপ করছিল। আমার রবার দেওয়া জুতো বন বিভাগের কর্ম্মচারীর মোটা মারহাট্টি চটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের পর হতে এই ব্যক্তি কি অশ্বপৃষ্ঠে কি পদব্রজে আর কখনও চটি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতেন না। কেন যে করতেন না সে কাহিনী তোমরা অতঃপর শুনতে পাবে। এই চটি ভিন্ন তাঁর আরও একটী বড় আদরের বস্তু ছিল—সে হচ্ছে তাঁর পাটকিলে রংএর দেশী টাটু ঘোড়াটি। তাঁরই পরিচর্য্যায় সেও বার্দ্ধক্য সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর এমন বন্ধু আর দুটী ছিল না। বনের মধ্যেই কর্মচারী মহাশয় জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছিলেন। ১৫ ক্রোশ পরিধি পরিমিত প্রদেশের প্রত্যেক পাহাড় প্রতি নালা করস্থিত আমলকবৎ তিনি জানতেন। কাজেই বনতীর্থ পথে এই পাণ্ডাটী যে আমাদের নিরাপদে নিয়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বনে বনে ঘুরে তাঁর গায়ের রং পোড়া ইটের মত পাটকিলে হয়ে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি রোদ কিছুতেই তাঁর সানাত না; ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কস্মিন কালেও তাঁর মনের প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হত না। একদিন সকালে দেখি কি তিনি জঙ্গলের জ্বরের প্রকোপে একেবারে ভাল্লুকের মত থর থর করে কাঁপছেন। এ জ্বর পুরান বন্ধু। থেকে থেকেই তাঁকে দেখা দিয়ে যেত। জ্বর আসা সত্বেও তিনি আসিয়া ভরসা দিলেন যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের সঙ্গ ধরবেন। সন্ধ্যার কিছু আগেই ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করে ব্রাউন টাটুর উপর সোয়ার হয়ে তিনি আমাদের শিবিরে এসে ঠিক উপস্থিত হলেন! এবার জ্বরটা তাঁকে অধিকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করেনি। তার বিদায়ের পর খুব খানিকটে কুইনিনের সঙ্গে ভরা এক পেট প্রাতরাশ

"সোয়ারের এক হাতে থাক্‌ত ছাতা আর অন্য হাতে পানের বাটা।"—(৭৩পৃষ্ঠা)

করে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে এসে দেখা দিলেন। এক জোড়া পুরান চটি জুতার মত যে ব্যক্তি জ্বরটাকে এমন করে ঝেড়ে ফেলতে পারে তাকে ভাগ্যবান বল্‌তে হবে বৈ কি? আমাদের হাতীর পায়ে বিশ্রী রকমের একটা কাঁটা ফুটেছিল; তিনি তার ডাক্তারীতে লেগে গেলেন। শোবার খাটিয়া খানা যদি ছোট হত তা'হলে তিনি কোন কৌশলে আর একটার সঙ্গে জুড়ে তার ত্রুটি অতি সহজে সংশোধন করে নিতেন। বিনা আড়ম্বরে তাম্বুর সমস্ত লোক যাতে আরামে থাকে তার বন্দোবস্ত করতেন। কোন সোর গোল না করে শিকারীদের কাছ হতে পুরো কাজ আদায় করে নিতে তাঁর মত এমন আর কেউ পারত না। বহু দূরে, যেখানে জনমানবের দেখা পাবার যো নাই, এমন সব জায়গায় কি করে যে তিনি রসদ জোগাড় করতেন দেখে আহ্লাদ হত, আশ্চর্য্য না হয়েও থাকা যেত না। দূরত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অদ্ভুত রকমের। মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড রৌদ্রে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে সেখানে পৌছুতে বেলা একটা হয়ে গেল। আমার গোন্দ পথপ্রদর্শক বলে শীতকালে সেই পথটা এক ক্রোশ আর গরমের সময় দুই ক্রোশ হয়! শুনলাম রামপেলা বলে জায়গাটি পাহাড়ের ওধারে। পাহাড়ের কাছে পৌছুতে বৈকালটা প্রায় কেটে গেল। সেখানে পৌছে রামপেলার দেখা পাওয়া গেল না; আমাদের অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন পিছিয়ে যেতে লাগল! আমার বন্ধু বন-বিভাগের এই কর্ম্মচারীটি পথের পরিমাণ করতেন তাঁর শারীরিক সামর্থ্যের পরিমাণ দিয়ে। যতখানি পথ তিনি ও তাঁর ভৃত্যবর্গ বিনা আয়াসে শ্রান্ত না হয়ে অতিক্রম করতে পারতেন তাকে তিনি ক্রোশ গণনার মধ্যে ফেলতেন না! ছুতোরের দরকার হওয়াতে শোনা গেল তাকে ডাকতে গ্রামে লোক গিয়েছে, সে শীঘ্রই আসবে। গ্রাম শুনলাম ৫ ক্রোশ দূরে! একটা খবর নিতে ১৪ ক্রোশ এক লোক পাঠাবার আবশ্যক হয়ে ছিল। বেলা যখন দুটো তখনও পত্রবাহক যাত্রা করলে না দেখে আমরা মনে করছিলাম এত ঢিলে দিলেত চলবে না। তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি হেসে বল্লেন ভোরের মধ্যেই উত্তর নিয়ে লোক ফিরে আসবে। পরের দিন সকালে দেখলাম তাঁর হিসাবে কোন ভুল হয় নি; আমরা যখন শিকারে বের হচ্ছি ঠিক সেই সময়ে চিঠীর জবাব নিয়ে লোক ফিরে এল। বাইসনের খোঁজে দিনের পর দিন কত ক্রোশই আমি হেঁটেছি সে কথা আমি বল্‌তে চাইনে। Snipe শিকার করতে গিয়ে সারাটা দিন ধরে ঘুরে মরেছি। কিন্তু এদের হাঁটবার ক্ষমতা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! তাদের কড়াপড়া মোষের চামড়ার মত শক্ত পা দুখানা দেখে আমার হিংসে হত,—মনে করতাম কোন যাদু মন্ত্রে আমার চরণ যুগলও যদি ঐ অবস্থা লাভ করতে পারে তবে সে আমার সৌভাগ্য।

ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন ভাল সোয়ার, তবে সে কিন্তু শুধু তাঁর আপন ঘোড়ার পিঠে। লাগাম জোড়াটা ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঢিলে হয়ে ঝুলত; সোয়ারের এক হাতে থাকত ছাতা আর অন্য হাতে পানের বাটা;—ঘোড়া খোস মেজাজে কখন দুলকি কখন কদমে চল্‌ত। এই দুটী প্রাণীর প্রাণ কোন নিগূঢ় যোগসূত্রে বাঁধা ছিল, একজনকে নইলে অন্য জনের আর চল্‌ত না। কিন্তু আর কেউ যদি "ব্রাউনের" পিঠে সওয়ার হওয়ার স্পর্দ্ধা করত, তবে আর তার দুর্দ্দশার সীমা থাকত না। না বলা কওয়া সে এমনি ছুট দিত যে তিনি অবিলম্বে ধূলায় গড়াগড়ি খেতেন। পিঠের বোঝা নামিয়ে ফেলে "ব্রাউন" খুসী মনে শান্ত উপত্যকাভূমিতে সবুজ ঘাসের সমালোচনায় মনোনিবেশ করত। আপন মনিবের সঙ্গে ব্যবহারে কিন্তু তার কখনও কোন ব্যত্যয় হয় নি। তার বয়স হয়ে আসছে, বেশী দিন

আর হয়ত টিকবে না। এই দুটী জীবের সেই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা আমি যখনই ভাবি তখনই মনে দুঃখ হয়।

আমার গল্পের খেই কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। সেই পর্ব্বত সঙ্কটের পাশটীতে যেখানে ইনস্পেক্টর সাহেবের পাঁচসিকা দামের চটি আমার পঁচিশগুণ বেশী দামের বুট জোড়াটাকে হার মানিয়ে দিয়েছিল। আবার আমরা হাতীতে উঠলাম। শীতের দিন, দেখতে না দেখতে বনের ছায়া দীর্ঘতর হল। সময়টা বড়দিনের কিছু আগে। ওভার-কোট-পরা আমার চেয়ে বন্ধু দেখলাম সাল জড়িয়ে বেশ গরমে আর বেশী আরামে রয়েছেন। সকাল ৮টা হতে আমরা বেশ ক্রমান্বয়ে চলেছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করলাম। পথ যেন আর শেষ হয় না। আমাদের বুদ্ধিমান পথপ্রদর্শক 'গোঁটিয়ার" তত্বাবধানে সন্ধ্যার পরে যে গ্রামে এসে পৌছিলাম সেটি কিন্তু মোটেই আমার গন্তব্য স্থান নয়। বন্ধুবর এ:তেও দমলেন না। কাঠ জড় করে গণগণে আগুণ জ্বেলে আমাদের শ্রান্ত ব্যথিত দেহের বিশ্রাম ও শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে দিয়ে, সে শীতের রাতে ঘোড়ায়, অন্ধকার বনের পথে আবার ব্যাগ বোচকা বিছানা প র তল্লাসে বেড়িয়ে পড়লেন ! রাত দুপ্রহরে ঘোড়ার পায়ের খট খট শব্দে লুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের শুভ সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌছল। পথ চিহ্নহীন; বনের পথে অন্ধকার রাতে তাঁর এই যাত্রা যে কত বিপদসঙ্কুল, তাঁকে কত কষ্ট যে সহ্য করতে হয়েছিল, সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কি পরিমাণ সহিষ্ণুতা ও সাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, সে কথা, যাঁরা এমন কাজ কোন দিন করেছেন, তাঁরাই বুঝবেন, অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নয়। সকাল হল। আকাশ পরিষ্কার, আর বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। বন পিটন যাদের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন দলে একত্র হয়ে তারা তাদের সামান্য রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছিল। জ্বালানি কাঠের অভাব ছিল না। শীত এমনই বেশী যে আগুণ না পোয়ালে বসা যায় না। শিকারীরা ফিরে এসে তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল আমাদের জানালে। বেলা দশটায় আমরা যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। যেখানে বসে আমাকে ঘাঁটী আগলাতে হবে, পাহাড়ের সেইখানটীতে পৌছতে অনেক আয়াস করতে হল। পথ দুর্গম, দুরারোহ আর বিপজ্জনক। ইনস্পেক্টর চটি খুলে ফেলে একখানা পাথর হতে আর এক খানাতে পা রেখে কাঠবেড়ালীর মত সহজে উঠে গেলেন। শিকারীরাও অনায়াসে তাঁকে অনুসরণ করলে। গন্তব্য স্থানে পৌছবার সেই সংকীর্ণ দুর্গম পথে, আমি দুই একবার উল্টে পড়তে পড়তে কি রকম যে বেঁচে গেছি, সেই কথা মনে হলে গাটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। শিকারীর মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের পরণে পাতার পরিচ্ছদ। কোমর হতে এই ঘাগরা গুলি তাদের হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছত। গাছের পাতা কোন গাছের সুতো দিয়ে একত্রে সুন্দর করে সেলাই করা। এগুলি দেখতে সুশ্রী; তা'ছাড়া সাধারণ কৌপীনের চেয়ে কাজের, ভব্য ও লজ্জানিবারক। এই শিকারীরা কাছেই কোন পাহাড় হতে আমাদের কাজে নেমে এসেছিল। তাদের আদিম অভ্যাসগুলি এখনও ত্যাগ করেনি। দু-একজন ছাড়া প্রায় সকলেরই অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনীয়। যদিও পরিধেয় বস্ত্র অতি সামান্যই ছিল, তবু তাদের সুগঠিত দেহসৌন্দর্য্য তাদের লজ্জা ও শীলতা দুই রক্ষা করেছিল।

শিকারীদের বাঘ খুঁজে বার করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। যাকে তারা খুঁজে ফিরছিল সে কিন্তু ইতিমধ্যে সবারি চোখে ধুলো দিয়ে অন্য পথে চলে গিয়েছিল। আমরা যখন তার পলায়নের পথ আবিষ্কার করবার জন্যে ঘুরে মরছি সে ততক্ষণে আধক্রোশ দূরে একটি পাহাড় পার হয়ে গিয়ে আর

একটি জন্তু মেরে বসে আছে! কি দুঃসাহস আর ধৃষ্টতা! তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে একটি মহিষ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একজন শিকারী তাকে জল খাওয়াতে গিয়ে দেখে তার ইহজীবনে সব তৃষ্ণা মিটেছে; বাঘ তার ঘাড় মটকে রক্তপান করে কিছু দূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে তখনও তার ঘাড় বয়ে রক্ত ঝরছে। একজন শিকারী বাঘের পায়ের চিহ্ন ধরে যেখানে মহিষ বাঁধা ছিল সেইখানে নিয়ে আমাদের উপস্থিত করলে। চারিদিকের পাহাড় জঙ্গল পেটান হল কিন্তু সুফল পাওয়া গেল না; আবিষ্কার হল যে হত্যাকাণ্ড সমাধা করে ব্যাঘ্র মহাশয় আর সেখানে প্রতীক্ষা করেন নি, অগ্রসর হয়ে গেছেন। সেদিনটি দিব্যি ঠাণ্ডা ছিল, দীর্ঘ ভ্রমণের অনুকূল আগেও যে ধরা পড়তে পড়তে তিনি বেঁচে গেছেন তার কারণ তাঁর কৃশকায়া। সেদিন শিকারে আমরা একটি প্রকাণ্ড সম্বর লাভ করিয়াছিলাম। সে পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে উপরে উঠছিল, আমার ৪৫০ নম্বরের কর্ডাইট গুলিতে মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে সে গড়িয়ে নীচে নালায় পড়ে গেল। তার শরীরের চামড়া নানা দাগে পরিপূর্ণ, একেবারে ক্ষতবিক্ষত। তবে আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সুন্দর শৃঙ্গযুগল সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

সেবারের যাত্রা যথাসম্ভব সার্থক হয়ে ছিল। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সম্বর আমার লভ্য হয়ে ছিল। তাছাড়া বিশ ক্রোশ পার্ব্বত্য পথের অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলাম। পরে এই বিজ্ঞতার সাহায্যে মৃগয়ার ক্ষেত্র মনোনীত করবার সুবিধা ঘটে ছিল। যে সকল বন্ধু লাভ করেছিল তাঁদের সাময়িক বলতে পার, কিন্তু তাঁদের নইলে শিকারে সে সময়ে কিম্বা ভবিষ্যতে কখনই সিদ্ধি লাভ হ'ত না। আর অরণ্যবিভাগের সেই কর্ম্মচারীর মত বন্ধুলাভ জীবনে সহজে হয় না।

বিপদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার সম্বন্ধে মনে তাচ্ছিল্যের সঞ্চার হয়। বিপদের অংশীদার, দুঃখের সরিকের সঙ্গে মনে প্রীতিবন্ধন যেমন দৃঢ় হয় এমন আর কিছুতে হয় না। তোমার সাথী সঙ্গীদের সঙ্গে সমভাবে যদি আরাম ভোগ করে নাও তাহলে, শুধু মৃগয়াযাত্রা কেন, যেখানেই যাও না কেন আনন্দের আর আরামের কিছুরই কোন অভাব কখনও হবে না।

অরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারীর মনে পাদুকা সম্বন্ধে চটির শ্রেষ্ঠত্ব কেমন করে অধিকার স্থাপন করে ছিল সে কথা না বলে আজকার কাহিনী শেষ করা যায় না। তিনি চুপচাপ একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও শার্দ্দূল প্রবরের সে পথে আসবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, কেননা শিকারের সব চেয়ে সুবিধাজনক জায়গাগুলি তাঁর প্রভু ও তদীয় বন্ধুবর্গ অধিকার করেছিলেন। এমন সময় স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের মত অতি সুস্পষ্ট গতিতে, শান্ত পদক্ষেপে শার্দ্দূলরাজ এসে একেবারে তাঁর সম্মুখে আবির্ভাব হলেন! এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! দ্বিধামাত্র না করে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে এক দৌড়ে তিনি নিকটবর্ত্তী গাছের কাছে উপস্থিত হলেন। চটিজোড়া পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক লাফে তিনি গাছে চড়ে বসলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হলে এ কাহিনী আর তাঁকে বলতে হত না, কেননা ব্যাঘ্রবীরও পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁর ঘাড়ে পড়বার মতলবে লাফিয়ে উঠেছিল। আর একবার অরণ্যপ্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে পার্ব্বত্য বন্য প্রদেশের মধ্যে দিয়ে চলেছেন, বিপদের কোন সম্ভাবনার সন্দেহ মাত্রও মনে উদয় হয়নি। হঠাৎ একটা চাপা হুঙ্কার শুনে সদলবলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন,—দেখলেন প্রায় ষাট হাত দূরে একটা বাঘ দিবা দ্বিপ্রহরে সদ্যোনিহত সম্বরমাংস আস্বাদনে তৎপর। তখনও ধ্যানের ভঙ্গীতে বসে আছে। যে মুহূর্ত্তে ইনস্পেক্টার দেখলেন যে সে অধীর ভাবে লাঙ্গুল আক্ষেপ

আরম্ভ করেছে তৎক্ষণাৎ চটিজোড়া ফেলে গাছে উঠবার পথ দেখালেন। অনুচরগণও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর পদানুসরণ করলে। এবারেও বিলম্ব হলে বিপদ ঘটত। কারণ, শার্দ্দুলরাজ স্বীয় একাধিপত্যের ক্ষেত্রে অপরকে অনধিকার চর্চ্চা করতে দেখে, রাজকীয় প্রাতরাশের বিঘ্নকারীদিগের শাস্তি বিধানের অভিপ্রায়ে সরোষে লম্ফের পর লম্ফ দিয়ে উদ্দাম সমুদ্রতরঙ্গের মত অব্যাহত প্রভাবে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন।

এক দিন নিঃশব্দে একটি মহিষাসুর (Bison) অন্বেষণ চেষ্টায় তাঁর চটিজোড়া গাছের তলায় ফেলে যান। নীচে উপত্যকায় নেমে যেতে হয়েছিল। ফিরে যখন পাদুকার সংস্থান ঠিক করতে পারেন নি তখন তাঁর মুখে যে দুঃখের ভাব প্রকাশ হয়েছিল, তাহা আমি কখনও ভুলতে পারব না। চটির সন্ধানে রীতিমত শিকারীর দল সাজিয়ে পাঠান হল। ভ্রষ্ট পাদুকা সম্মিলনে তিনি যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, বিরহিনী পক্ষীবণিতা সুদীর্ঘ প্রবাস-প্রত্যাগত দয়িতের সন্দর্শনে তেমন আনন্দিত হয় কি না সন্দেহ।

এবারকার মৃগয়াযাত্রার শেষ ঘটনা বর্ণনাযোগ্য। রঙ্গভূমিতে শেষে প্রায়ই প্রহসন অভিনীত হতে দেখা যায়। আমরা কোনও কৃষকের গোলাবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। অতি সুন্দর পরিপাটী, চারিদিকে পাহাড়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেইখানে গিয়ে শোনা গেল ক্রোশ কত দূরে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হয়ে আমরা অনেক খানি পথ অতিক্রম করে এসেছিলাম। কথা ছিল কপিলাশে গিয়ে বিশ্রাম করব। আর সেখান হতে সকালের সেই পঁচিশ ক্রোশ বিচিত্র সুন্দর পথ বায়ুরথে আরোহী হয়ে রেলওয়ে-ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করব। কলনাদিনী তন্বী একটি গিরিনদীকে পথ ভুলিয়ে ক্ষেত্রের মধ্যে ডেকে আনা হয়েছিল। সেও এই যত্নরক্ষিত বিশাল প্রান্তর পথে সানন্দে গান গেয়ে চলেছিল। প্রচুর ফল ফুল শস্যে গ্রাম্য কুটীরখানি কমলালয়ের মত লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন। বনের মধ্যে তাম্বুর নীচে, কিম্বা ভাঙাচোরা খোড়ো ঘরের আশ্রয়ে কষ্টেরও দিন যাপন করবার পর এই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে আমার একটুও মন ওঠেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বে তবুও যাত্রা করতে হল। প্রথমে বায়ুরথে বাহিত হয়ে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ ছয় মাইল পথ অতিক্রম করলাম। সেখানে গজরাজ আমার প্রতীক্ষায় ছিল। তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে মন্দমন্থরগতিতে মাচানের কাছে উপস্থিত হলাম। আকাশে চাঁদের হাট বসেছিল। চারিদিক আলোয় আলোয় যেন উথলে পড়ছিল। তার উপর বনের মধ্যে শীতের প্রকোপ অধিক ছিল না। একলাটি শান্তভাবে ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করছিলাম। তাঁর আবির্ভাবের আশা বড় বেশী ছিল না, কেননা যেমন বিলম্বে সমারোহে ও সশব্দে আমাদের আগমন হয়েছিল তাতে এ জাতীয় জীব বড় একটা দেখা দেয় না ; গা ঢাকা দিয়েই থাকে। রাত্রি যখন নয়টা, বনপথে চন্দ্রালোকের দূর সম্পাতে মৃতমহিষের সংস্থান প্রদেশটি অস্পষ্ট অদৃশ্যপ্রায় হয়ে এল। অদৃশ্যপ্রায় কেন অদৃশ্যই হয়ে গেল ; কেবল আমার অনুভূতির মধ্যে তার স্মৃতি জাগরূক রইল। বাহিরের দৃশ্যের মধ্যে সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হয়ে গেল। ছায়ায় আত্মগোপন করে, একটী জন্তু মৃত মহিষের কাছে লঘু পদশব্দে অগ্রসর হয়ে আসছিল। দেহগৌরব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কে বলতে পারে এই শ্বাপদ জন্তুটি অপরের অপেক্ষা সাবধানী নিঃশব্দ-চারী কি না ? আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আগন্তুক মহিষটিকে ধরে টানাহেঁচড়া করছে। দেখলাম কিম্বা মনে হল দেখলাম, যেন এই ভক্ষকের ছায়ায় তার পৃষ্ঠদেশ দুরূহ চেষ্টায় পরিশ্রমে কেঁপে কেঁপে
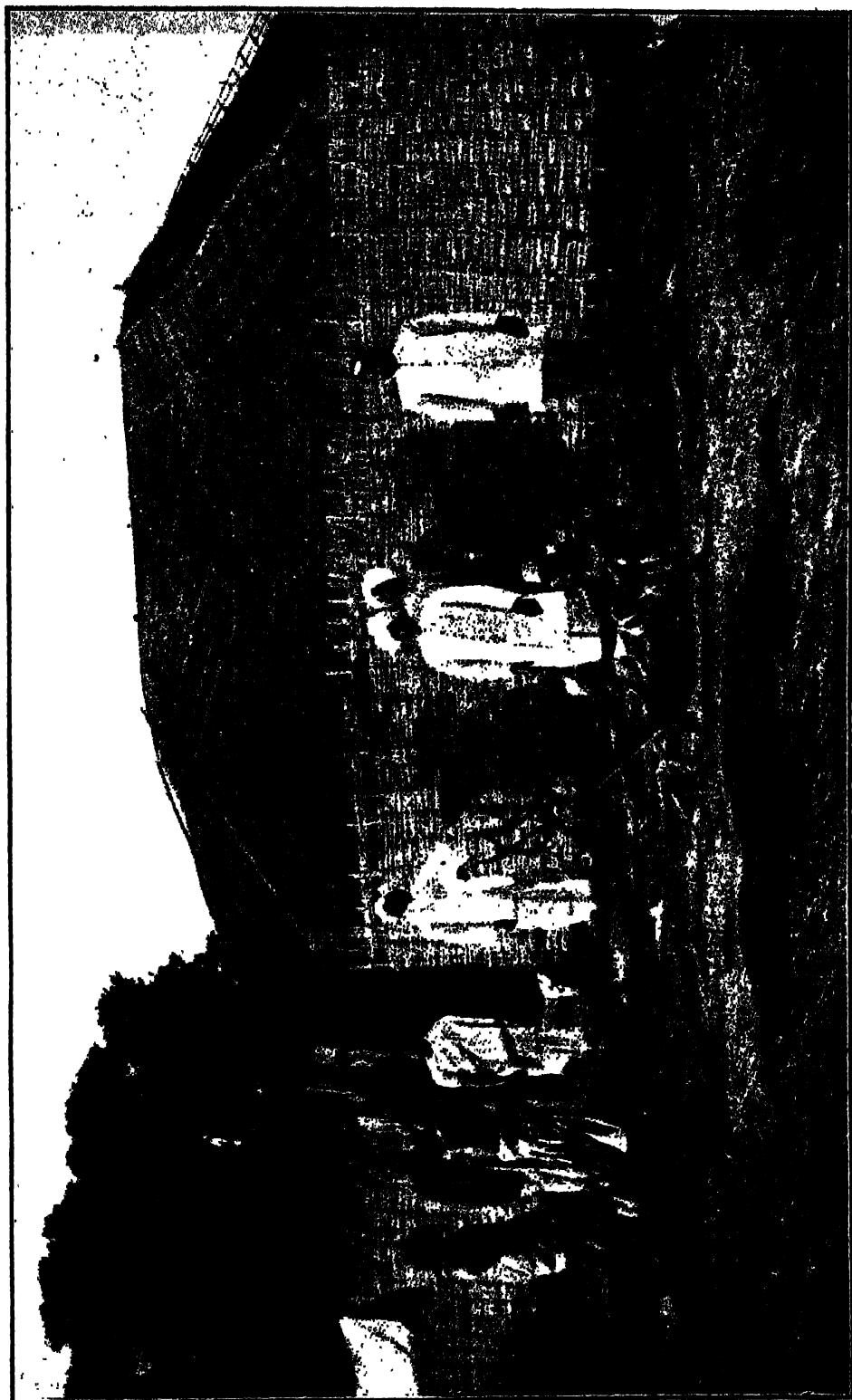
উঠছে। কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন এর বেশী আর কিছু দেখা গেল না। আলো যে আরও উজ্জ্বলতর হবে তার কোন আশাই ছিল না, কেননা চন্দ্রদেব যে পথে যাত্রা করেছিলেন সেটি তাঁর অস্ত পথ; ফিরে আসার প্রতীক্ষা করা একেবারেই ব্যর্থ। সেই জন্যে সেই নিশাচর ছায়া মূর্ত্তিকেই ব্যাঘ্র কল্পনা করে বন্দুক ছাড়লাম। বন্দুকের শব্দের তীব্র প্রতিধ্বনির সঙ্গে একটী ভীষণ আর্ত্তনাদ বনভূমিকে যেন বিদীর্ণ করে দিলে। আহত জন্তুটি বাঘ নয়, হায়েনা (Hyaena)! যে নাটকে আমি আপনাকে নায়ক-গৌরবে ভূষিত করে তুলতে উৎসুক ছিলাম এতক্ষণে সেটি হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হল। কোথায় আরণ্য সামন্তাধিপতি শার্দ্দুল আর কোথায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্রন্দনানুকারী হায়েনা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার নিমন্ত্রণ কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ব্যাপার শুনে আমার সঙ্গে তিনিও প্রাণ খুলে হাসিতে যোগ দিলেন। হাসি আমি হাসলাম বটে তবুও ব্যাপারটা অন্য রূপ হওয়াই মনে মনে কামনা করেছিলাম।

১১ই জানুয়ারী ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

এখন একবার চল আমরা বাঙ্গালার সমতলভূমিতে ফিরে যাই। সে আমার দেশ—স্নাইপ, হংস, বরাহ আর চিতার বিচরণ-ভূমি। এরি মধ্যে যে জায়গা তোমরা ভাল করে জান আর দেখেছ আমি তারি কথা বলব। ব্যাঘ্রাবতার আর মহিষাসুর—চলন বিলে জলাভাব আর চারিদিকে পাটের চাষের পরিপাটী প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই—প্রবাসে অনুকূল উপনিবেশ স্থাপন মানসে স্থানান্তরে যাত্রা করেছে।

স্নাইপ।

স্নাইপ সেখানে দেরী করে আসে, কিন্তু যখন তারা আসে তখন মেঘমালার মতই সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে দেখা দেয়। কলিকাতা হতে অধিক দূর নয়। ইচ্ছা করলে ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বেই দু'চার জোড়া হস্তগত করা চলে। কিন্তু তাতে বড় বিশেষ লাভ নেই, গৌরবও অল্প; যদি এ ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম উপস্থিতির আনন্দটা গণ্য না কর। সেপ্টেম্বর অক্টোবরই স্নাইপ শিকারের সব চেয়ে ভাল সময়, কিন্তু সে সুদূর পল্লীগ্রামে ডিসেম্বর অবধি প্রতীক্ষা করতে হয়। তখন বিশাল বিলখানি পদ্মফুল আর আগাছায় ভরে ওঠে। আমার কিন্তু নৌকায় চড়ে শিকার করার চেয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে শিকার করতেই বেশী ভাল লাগে। পায়ে হেঁটে সোজা গুলি চালাবার সুবিধা অধিক। নৌ-বিহারে বিহঙ্গ সংহারে আনন্দের অসদ্ভাব হয় না, তবে দুঃখের বিষয় এ সুখ চির দিন রহে না। তালের ডোঙ্গা বড় বিশ্রী, কাজ-সারা ব্যাপার। যখন দুখানা একত্রে বেঁধে নেওয়া হয়, তখনও তার তাল সামলান দায়; কথায় কথায় ভরাডুবি হতে চায়। কতবার আমি এই উপায়ে ছোটখাট খাল বিল পার হয়েছি তার ঠিক নেই, তবে একটীবার কোন পৌষ প্রভাতে একটী খালের অন্ধিসন্ধি আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে যাত্রা করে উল্টে পড়ে নাকানি চুবানি খাবার পর হতে মনটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে মাঝি লগি বেয়ে আমায় পারে নিয়ে যাচ্ছিল, ডোঙ্গা উল্টে যাওয়াতে সে কিন্তু বিচলিত হয়নি। সেতো ডোঙ্গা আঁকড়ে পড়ে রইল, তার পুরী জল ছেঁচে ফেলে সব ঠিকঠাক করে নিলে। ভিজে কৌপীনে তার মানসিক স্থৈর্য্যের কোন হানি করেনি। আমি কিন্তু ভিজে কাঁথা হয়ে

সাঁতার দিয়ে কোন রকমে পারে পৌছিলাম। দৃশ্যটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল এ কথা বল্‌তে পারিনে। জলাভূমি আর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ কায়ক্লেশে অতিক্রম করবার সময় রোদে বাতাসে সব শুকিয়ে ঠিক হয়ে যেতেও বেশী সময় লাগেনি।

একবার নাকানি চুবানি খেয়ে আর কয়েকবার এ বিভ্রাট হতে আত্মরক্ষা করে, আমি অবশেষে একখানি ডোঙ্গা নিজে তৈয়ারি করেছিলাম। পিয়ানো বাজাবার টুলের মত তার ঠিক মাঝখানে, চারদিকে ঘোরে এমনি একটা বসবার জায়গা করে নিয়েছিলাম। তেমন বেশী উঁচু নয়; আর ঠিক জায়গাটিতে বসলে ডানধার হতে যে স্নাইপ উড়ে উঠত সহজেই তাদের হিসাব নিকাশ করা চলত। পদ্মবনে তাদের খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল না, কিন্তু যেগুলো আগাছার মধ্যে গিয়ে পড়ত তাদের বার করাই হত বড় মুস্কিল। ডোঙ্গাটি যতদূর সম্ভব আগাছার উপর এগিয়ে দিয়ে ডোঙ্গার উপর হতে একটা লম্বা লগি ফেলা হ'ত, তখন মাঝিদের মধ্যে একজন তারি উপর দিয়ে সাবধানে পুলের মত করে হেঁটে গিয়ে পাখী কুড়িয়ে আনত।

একটা দাঁড় নিয়ে নিজের টলমল অবস্থা সামঞ্জস্য করে লগিটাকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলতে লাগল। অনেক সময় তার হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল। তার এই গতিবিধি দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়ে যায়নি। তাই যতক্ষণে সে নিরাপদে তরি নিয়ে তীরে না পৌছল ততক্ষণ মনে সোয়াস্তি পেলাম না। দৈবাৎ ঘটনা হতে উদ্ধার করবার জন্যে আমি সর্ব্বদাই একটা লম্বা দড়ি কাছে রাখতাম। কাজটা বিশেষ বিপজ্জনক হলেও যারা এ কাজে লিপ্ত থাকত তারা তেমন কিছু মনে করত না; বেশ সহজ ভাবেই চলাফেরা করত।

আমার একটী Bull Terrier কুকুর ছিল, তার নাম Lucy। সে আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, আর কালক্রমে চমৎকার শিকারী হয়ে দাঁড়াল। মারা পাখী সে অতি নিপুণতার সঙ্গে উদ্ধার করে আন্‌ত। বাধা দেবার আগেই সে স্নাইপ খুঁজে আনবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আগাছায় আটকে একবার মারা পড়বার মত হয়। অনেক কষ্টে তাকে সেবার রক্ষা করেছিলাম। বেচারা Lucy এত দিনে সে রম্যতর কোন মৃগয়াক্ষেত্রে বিচরণ করছে; আর কখনও ফিরবে না। তবে শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় হয়ে সে যখন ডুবে যাচ্ছে তখনও যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্নাইপটিকে মুখে করে রেখেছিল, এ কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

মহিষের পাল অনেক সময় এই ঘন আগাছায় ঢাকা জলাভূমিতে চরতে আসে। তাদের পায়ের চাপে একবার যখন এই গুল্মলতা-আচ্ছন্ন প্রান্তর ভেঙ্গে গিয়ে গলিপথের সৃষ্টি করে, তখন সে পথে সহজেই ডোঙ্গা চালিয়ে যাতায়াত করা যায়। এক দিন এমনি এক দল মোষ বিলের উপর চরছিল, আর যখনি আমার গুলির আওয়াজ হচ্ছিল তখনই চমকে উঠে পা ছুঁড়ে এই আগাছার রাশি চাপা দিয়ে দাবিয়ে দিচ্ছিল। তাদের এই ভয় আর এ ভয়ের অভিব্যক্তি দেখতে ভারি মজার। স্নাইপ-গুলিকে আমার দিকে তাড়িয়ে আনবার জন্যে অন্য নৌকায় আরো জনকত লোক ছিল। আমি তাদেরি এই মহিষের পালকে শাসনে রাখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম আর আমি নিজে আমার আস্তানা বদল করে এই সুযোগে অতি সহজেই অনেকগুলি স্নাইপ মারলাম।

কোন কোন ঝিলে আগাছায় ভরা ঘাসে ঢাকা চলন্ত কতকগুলি দ্বীপ থাকে। সূর্য্যের তাপ যখন অত্যধিক হয়, স্নাইপের ঝাঁক গিয়ে তারি মধ্যে আশ্রয় নেয়। চুপি চুপি নৌকা বেয়ে তার কাছে

যেতে হয়। অবশ্য পাখীর ঝাঁকটা উড়ে কোন দিকে গেল আগে সেটা ঠিক করে রাখা আবশ্যক। কতকগুলো পাখী আবার অত্যন্ত কাছে থাকে। হঠাৎ উড়ে উঠে তোমাকে চমকে দেয়, ফলে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। ঘুরে বসে তাদের মারবার চেষ্টা করা সব সময় নিরাপদ নয়। ছোট মাছ ধরা নৌকা হঠাৎ উল্টে যাবার সম্ভাবনা অধিক। তা যদি হয় তবে গভীর বিলে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়।

একজন বন্ধু আমাকে একবার একখানি নৌকা উপহার দিয়েছিলেন। সেখানি খাট দাঁড় দিয়ে বাইতে হয়। আমি তার তলাটা দুধারে সমান করে দাঁড় বাইবার আর লগি চালাবার দুই ব্যবস্থা করে, বসবার জায়গা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। যাঁরা এ বিষয়ে বোঝেন তাঁরা বলেছিলেন, হাঁস শিকারের পক্ষে নৌকাখানি নিরাপদ। সেই স্মরণীয় দিনে আমাদের বিলে অনেক হাঁস আর লালসেরা এসে জমা হয়েছিল। বিলটি লম্বা চওড়ায় দু ক্রোশ। চারিদিকে তার পদ্মফুলের পাড় আর শরবনের আঁচল। এই নূতন নৌকায় এক দিন আগাছায় ঘেরা গলিপথ পেরিয়ে আমরা স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে পাখীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে যেন উড়ে চলেছিলাম। বন্দুক আমার হাঁটুর উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল। চারশো হাত গেছি বোধ হয়,—কিন্তু জানিনে কেন, হয়ত বা সব শিকারীরাই একটু কুসংস্কারাপন্ন,—যাই হোক আর যে কারণেই হোক, কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হল বিপদ সম্মুখে। যদিও এ আশঙ্কাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি তবুও কিছুতেই সে মনোভাব দূর করতে পারলাম না, বরং ক্রমশঃই বেড়ে চলল। তাই মাঝিকে আমি ফিরবার হুকুম দিলাম। আগাছার মধ্যে দু চারটা করে অনেকগুলি স্নাইপ মারলাম। ডাঙ্গা প্রায় দুশ হাত দূরে। আমরা সানন্দে সত্বরগতিতে এগিয়ে চলেছি। একটা চলন্ত দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটা স্নাইপ আমার ডান হাতের দিক থেকে উঠে, পিছনের দিকে উড়ে চলল। আমি ঘুরে বসে গুলি মারলাম, পর মুহূর্ত্তেই জলে পড়ে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাণরক্ষার জন্যে সাঁতার দিতে হল। ফিরে দেখি মাঝিকেও তাই করতে হয়েছে। "সাধের তরণী" কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছে তার ঠিক নেই। চারিদিকে কেবল তার গতজীবনের সাক্ষ্য-স্বরূপ কতকগুলি মৃত স্নাইপ মাত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। শিকারের ভারী জুতো পায়ে সেই আগাছার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে চলা হতাশের আক্ষেপে পরিণত হবে বলেই মনে হচ্ছিল। আমি তবু আমার আহেল বিলাতী নূতন Holland and Holland'এর লম্বা নল বন্দুক আঁকড়ে চলেই ছিলাম। কিছু দূরে কাদায় পোঁতা লম্বা লগিটার কাছে যদি কোন মতে পৌছতে পারি তারি চেষ্টায় ছিলাম। তখন আমার অবস্থা "শ্রান্তি আসে জীবন ব্যাপিয়া"। এই লগিগুলিতে জাল শুকুতে দেওয়া হয়, কাদার মধ্যে খুব গভীর ভাবে পোঁতা থাকে। কোনরূপে এরি একটার কাছে পৌছতে পারলে জীবন নিরাপদ হবার সম্ভাবনা। যদিও এ সম্ভাবনা ক্রমশঃই হ্রাস হয়ে আসছিল, তবু আমি বিচলিত হইনি। ইতিমধ্যে আবার আমার দক্ষিণ চরণখানি আগাছার মধ্যে আটকে গিয়েছিল। আমার নৌকার মাঝিটির অবস্থা যে আমার চেয়ে কিছু সুবিধাজনক হয়েছিল তা নয়। যদিও তার ডোর কৌপীন ছাড়া দ্বিতীয় পরিধেয় ছিল না। আর আমার বিলাতী বুট ও শিকারীর দুর্ভর পরিচ্ছদ, সহজে গা ছাড়া করা কঠিন। তবু মাঝি বেশী জড়িয়ে পড়েছিল। সেই অবশেষে ডুব জল কি না দেখতে গিয়ে আবিষ্কার হল মাটী নাগাল পেতে পারে, জল তার নাক বরাবর আসে। সে চীৎকার করে আমাকে তার অবস্থা জানালে। হাত দশেক দূরে শুধু তার মুখখানা টোপা পানার মত ভা ছিল। মরি বাঁচি অবস্থায় কোন মতে আমি তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। দুঃখের দোসর দুজনায় কিছুক্ষণ সেখানে সেই ভাবে

রইলাম। তার পর জেলেরা এসে আমাদের উদ্ধার করলে। পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতের ভোর বেলা; তার উপর অবস্থা যা তাতো পাঠকের অবিদিত নেই; এই অবস্থায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে হল। দৃশ্যটি কাব্যের অনুকূল হয়নি তা বলাই বাহুল্য। রাজকবি টেনিসন কোন মৎস্য-কুমারের শৈবালে আবদ্ধ হবার কথা বর্ণনা করেন নি।

আমার বন্দুক যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের বাহাদুরী বলতে হয় যে এমন অবস্থায়ও এক বিন্দু জলও তার ঘোড়ার মধ্যে ঢুকতে পায়নি। এই বিপত্তির দুর্দিনের মধ্যে ম্যান্টন কোম্পানী সব কল কব্জা খুলে সপ্তাহ কাল রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু এ ভাবের কোন চিহ্নই আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এবারের ও আর একবারের দুর্ঘটনা হতে মনে কোরনা যেন স্নাইপ শিকার বিপজ্জনক ব্যাপার। আমি একটা বিলের ধারে ধারে শিকার করে চলেছিলাম। গত অভিজ্ঞতা হতে জানা ছিল এর মধ্যে কোন্ কোন্ জায়গা বিপদসঙ্কুল। সেগুলি আমি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলাম। তবে সব সময় ত আর মাটীর দিকে চেয়ে হাঁটা চলে না। বিশেষ শিকার করতে হলে উপর নজর দরকার। হঠাৎ বুঝলাম আমার কোমর পর্য্যন্ত কাদার পুঁতে এসেছে আর আমি ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি। অসময়ে এই রসাতলে যাত্রা বড় বাঞ্ছনীয় মনে করিনি। বিশেষতঃ, প্রথমেই তার যে বিরস পূর্ব্বস্বাদ পাওয়া গেল তাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হবার কথা নয়। এই সম্ভাবনা নিবারণ করবার জন্যে আমি হাত দুটো ডানামেলা চিলের মত দুধারে যত দূর চলে সোজা করে ছড়িয়ে দিলাম। শিকারীরা আমার দুরবস্থা দেখে ভারি ভীত হয়ে পড়ল। তার মধ্যে একজন তার ধুতি খুলে আমার দিকে ফেলে দিলে আর সবাই মিলে টানা হেঁচড়া করে বোতলে এঁটে যাওয়া ছিপির মত আমায় তুলে বার করে আনলে। গর্ত্তটি অবিলম্বে পূর্ণ হয়ে গেল। সে পথে রসাতলে উঁকি দিয়ে দেখবার আর আমার সুযোগ হল না।

সাপের কথা যদি বল দুবার ছাড়া আমি কখনও বিষাক্ত সাপের সংস্পর্শে আসিনি। জুতা মোজা পরা থাকলে এ পরশ কিছু করতে পারে না। তবু সত্যি কথা বলতে গেলে এ অবস্থায়ও আমার ভয় হত, কিন্তু যে দুবার দেখা হয়েছিল নদী তীরে নয়, মাঠভুমিতে। তারা কালসাপ; মাঠের আলের উপর শুয়েছিল। সময়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম বলে ৮ নম্বরের গুলি দিয়ে তাদের খণ্ড খণ্ড করতে পেরেছিলাম। যদিও অত নিকট সান্নিধ্য সুখকর মনে হয়নি। কত জায়গায় ঘুরেছি, বিষাক্ত সাপের সঙ্গে এই দুবার ছাড়া আর একবার দেখা হয়েছিল। সেবারে আমি একটা চিতার পিছু নিয়েছিলাম। একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে চুপচাপ মোড়ায় বসে আছি, হঠাৎ পাতার মধ্যে শব্দ পেয়ে চেয়ে দেখি, আমার পায়ের কাছের গর্ত্ত হতে একটি গোক্ষুর সাপ বেরিয়ে আসছে! আমার বন্দুকে কোন কাজ দিত না। আর সাপটি এতই কাছে এসেছিল যে তাকে ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছিল না, পাছে সে ভয় খেয়ে আমাকে আক্রমণ করে। তাই নিঃশব্দে নিশ্চল অবস্থায় শ্বাস রোধ করে, তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। দুবার আমার কাছে আসবার জন্যে ফিরলে, আর সে সময় আমার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হওয়া কিছুতেই নিবারণ করতে পারলাম না। তার পর আবার সে ফিরে শিকারীরা যেখানে ১০০ হাত দূরে ঘন আঁখের ক্ষেত হতে বেরিয়ে আসছিল সেই দিকে এগিয়ে চলল। এই সময় একটা ঘাসের চাবলা ছুঁড়ে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। এর বঙ্কিম কুটিল গতিভঙ্গী বড়ই মনোহারী, যদি না সেই সঙ্গে প্রাণঘাতী হত! আমি চীৎকার করে শিকারীদের সতর্ক করে দিলাম। সেদিনের মত শিকারের সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হল বলে কিছুই দুঃখিত হইনি।

ঝিলে জঙ্গলে শিকার

চৈত্রের শেষে আসামে বাঘ শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় বেশ এক ঝাঁক স্নাইপ মারা চলত। হাতীগুলি যখন বিক্ষিপ্ত ভাবে আঁকা বাঁকা পথে দীর্ঘ ঘাসের মধ্য দিয়ে যেত তখন এই জাতীয় পাখী চারিদিক হতে উড়ে উঠত; শিকারীদেরও অবাধে গুলি চালাবার সুযোগ ঘটত। আমি বাংলা দেশের নামাল জমিতেও এই সময়ে স্নাইপের দেখা পেয়েছি। একবার নববর্ষে হালখাতার সময় ট্রেণ যখন খালের পাশ দিয়ে চলছিল তখন শুক্‌না আর শিলিগুড়ির মাঝপথেও এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাদের "নিজ বাসভূমে", হরিপুরে, বিলের শুষ্ক ঘাসের মধ্যেও এ সময় দু এক জোড়ার দেখা পাওয়া যায়। মোহনলাল হস্তীপ্রবর খাট' পথে যাবার জন্যে বিলের শুকনা ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলেছিল। হঠাৎ স্নাইপের ডানার শীষ দেওয়ার মত শব্দ আমার মন আকর্ষণ করলে; চেয়ে দেখলাম এক জোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্নাইপ অন্য দিক দিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। সেই পথে পর বৎসর যাবার সময় ঠিক সেইখানটিতে স্নাইপ সন্ধান করতে গিয়ে আবার এক জোড়া আবিষ্কার হল। এরা সেই গত বৎসরের পরিচিত দম্পতি কিনা কে বলতে পারে?

বাংলা দেশের চারিদিকে অনেক সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়। এর এক একটীর বিস্তার পাঁচ সাত বিঘা জমির বেশী হবে ত কম নয়। গ্রামের বাহিরে বিল ও জলাভূমির সুবিধা নিয়ে কোন্ সত্যযুগে ক্ষেতে জল দেবার জন্যে এগুলি কাটা হয়েছিল। এখন আর কেউ তাদের সংস্কারাদি করে না, পানায় আর ঘাসে ভরে উঠছে, গোচারণ-ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এরি নিভৃত নিরালায় নিরাপদ আশ্রয়ে স্নাইপেরা সুখে বসবাস করে। দু এক গুলি করলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে উঠে জলের মধ্যে পড়ে অন্তর্দ্ধান হয়। তখন তাদের তাড়িয়ে বার করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে লম্বা একটা দড়ি দুধার হতে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। যদিও এটা সদুপায় বলা চলে না, কেন না আশানুরূপ ফল লাভ হয় না।

যদি পাখীদের বিশেষ করে পরিচয় নেবার সুযোগ নাও ঘটে, তাহলে তারা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় দেখতে পেলে তাদের বসত বাটীর সন্ধান করা কঠিন হয় না। ভাদ্র মাসে বিশেষ করে তাদের কখনো ফসল-কাটা ক্ষেতে কখনো পতিত জমিতে মাঝে মাঝে পাটের চাষের কিনারায় দেখা যায়। প্রায়ই যখন দেখা যায় মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন চিল উড়ে বেড়াচ্ছে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে কিছু কিন্তু আছে, সেখানে প্রায়ই মনের মত শিকারের খোঁজ মেলে। শকুন চিল কিন্তু বড় উৎপাত করে, ওৎ পেতে থাকে, মরা কিম্বা আহত পাখীটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে পলায়ন করে। মাঝে মাঝে যখন একটু অধিক অনধিকার চর্চ্চা করে বসে, তখন তাদের শাস্তি না দিলে চলেনা। চিল যে কি রকম কাঠ-প্রাণী পাখী তা না দেখলে বিশ্বাস করা সহজ নয়। এই রকম একটী চিলকে কোন রবিবারে চৌর্য্য কার্য্যে বমাল ধরে সাজা দিয়ে ছিলাম, তার ডানা ভাঙা যায়, গায়েও আঘাত পেয়েছিল। তাই একজন শিকারীকে তার ভবযন্ত্রণা মুক্ত করে দিতে বলি। শিকারী তাকে এক ডাণ্ডা মেরে ফেলে এসেছিল। মনে করে ছিল বুঝি কাজ হাসিল হয়েছে। পরের রবিবারে সেই পথে যেতে দেখলাম সে তখনও বেঁচে আছে, যদিও মুমূর্ষু অবস্থায়। কেমন করে অনাহারে অতদিন জীবন ধারণ করেছিল সে রহস্য এখনও ভেদ করতে পারিনি। একদিনে অনায়াসে অনেক স্নাইপ মারা কঠিন নয় কিন্তু দুই কিম্বা তিন কুড়ির অধিক হত্যা করা অন্যায় মনে করি। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে আমি আর আমার একজন বন্ধু একই বিলে আর জলাভূমিতে শিকার করে আসছি।

জায়গাটী তাঁর খাস জমিদারী। সেখানে তাঁর অবাধ অধিকার। খুসী হলে একদিনেই স্নাইপদের সবংশে নিধন করবার কোন বাধা ছিল না। তবু আমরা কখনও যথেচ্ছা হত্যাকাণ্ড ঘটাইনি। তিনি খুব নিপুণ শিকারী হয়েও পরদিনের জন্যে বুদ্ধিমানের মত কিছু সঞ্চয় রেখে আসতেন। সঙ্গে দু একটী হাতী থাকত। তাই অত্যধিক হাঁটবার পরিশ্রম লাঘব করে, তাজা হয়ে অনেক পাখী মারা কিছুই কঠিন হ'তনা, দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও যাওয়া চলত। একদিনের কথা এখনও খুব মনে পড়ছে। যেন কালকার কথা। যে জমিতে আমরা শিকার করে গেছি ফিরবার পথে সেখানে ঠিক আমাদের পায়ের কাছ হতে এক ঝাঁক উড়ে উঠে একটু দূর গিয়েই মাটিতে নেমে পড়ল। তাদের এমন শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বহু দূর পথের যাত্রী, সংখ্যায় প্রায় দুশ। তাদের দেখে বিহার প্রদেশের একটা দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে জেগে উঠল। একজন কৃষক এক ঝাঁক পঙ্গপালকে বার বার তাড়াবার চেষ্টা করছিল। তাড়া খেয়ে উড়ে উঠে তারা একটু দূর গিয়েই নেমে পড়ছিল। এতদূর হতে এমন শ্রান্ত হয়েই এসেছিল যে তাদের আর চলচ্ছক্তি ছিল না! সেদিন আমাদের শিকারের ভাগ্য ভাল ছিল, ইচ্ছা করলে অনায়াসে এদের মেরে একটা ঐতিহাসিক যশ অর্জন করা কঠিন হত না, কিন্তু সুখের বিষয় সে ইচ্ছা আমাদের হয় নি।

চিত্র বিচিত্র পাখাওয়ালা স্নাইপ দেখতে বড় সুন্দর, কিন্তু তার জন্যে ছররা বারুদ খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের পরিচয় লাভ অতি সহজ ব্যাপার। পোষাকের বাহারে আর নেচে চলার ভঙ্গীতে অনায়াসে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংখ্যাও অল্প। অপ্রত্যাশিত জায়গায় যেখানে তৃণ গুল্ম খুব ঘন সেই খানে তাদের দেখা পাওয়া যায়। এই জাতীয় দম্পতিদের পতিরদল যথাকালের কিছু পরে এসে দেখা দেয়। দল তাদের ভারী নয়, দেখতে এত ছোট যে ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে যেখানে উড়ে ওঠে সেখানে মারা আর ছাড়া দুই এক কথা। যাদের পুচ্ছ দেখতে তালপাতার হাতপাখার মত তারা আগে আসে, আর যারা দেরীতে। আর যাদের ছুঁচের মত সরু লেজ, তারা খুব শীঘ্র উড়ে পলায়। তাদের ডানার কম্পনে যেন বিজুলি খেলে যায়। ভাদ্র আশ্বিনের তপ্ত দিনে শিকার করা সহজ, যদি না বৃষ্টি-ধোয়া রোদের তীব্রতা তোমার মস্তিষ্কের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। সে সময়কার স্যাঁত স্যাঁতে জল বাতাস যমের দক্ষিণ দুয়ার একেবারে খোলা থাকে, এই তো প্রবাদ। এ সময়, বিশেষ জোয়ান না হলে, যম রাজার শাসন এড়ান দায়। কেননা তিনি তখন তাঁর দণ্ড উদ্যত করেই রাখেন। শুধু অবয়ব দৃঢ় আর শ্বাসযন্ত্র সবল হলেও হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যও যদি পেয়ে থাক তবু শারীরিক নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করাও চলে না। বাছা কল্যাণ, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, বাল্যাবধি স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্ত সহজ বিধি নিয়ম যদি মেনে চল, তাহলে তোমার তিতিক্ষা শীতাতপ হতে সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করবে। সূর্য্যের কিরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রথমটা সহজ নয়, কিন্তু এ রৌদ্র স্নানে কারো কোন ক্ষতি হয় না, যদিনা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অসংযত হয়ে স্বাস্থ্য হানি করে থাক।

আমার মনে হয় স্নাইপ মারবার জন্যে 12-bore বন্দুকই যথেষ্ট। যদিও 16-bore বন্দুক হতে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। তবে সে ভেল্কি বাজী মানুষের হাতের গুণে, যন্ত্রের বাহাদুরীতে নয়। বন্দুক যাঁরা গড়েন শুনেছি 16-bore বন্দুকের গঠন প্রণালীতে এমন নৈপুণ্য নিয়োগ করে থাকেন যে কাছাকাছি তার গুলি ৪০ গজের মধ্যে খুব জোরের সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে ফল নির্ঘাত ফলে। মেঘলা কিম্বা ঝোড়ো দিনে ৪০।৫০ গজের চেয়ে দূরে পাখী উড়ে উঠলে কিছু

হওয়া অসম্ভব। সে সময় এই বন্দুক ব্যবহার কর্ত্তে কারো দ্বিধা হবার কথা নয়। মাঝে মাঝে 12-bore বন্দুক বহে নিয়ে বেড়াতে তার গুরুভারে হাত দুখানি একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন তনুদেহ 16-bore আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলে হাড় যেন জুড়িয়ে যায়, আপনার অজ্ঞাতে আরামের নিশ্বাস পড়ে। কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ পক্ষীরা যদি গৃহপালিত কুক্কুটের রীতি নীতি অনুসরণ করে, উড়ে উঠে নেমে পড়ে, তোমার ক্ষিপ্রতার দারুণ পরীক্ষা নিতে চায়, তখন শস্ত্রের শোভনতা ও তনুদেহের মায়া ত্যাগ করে বিপুল ভার বহনের জন্যেই মন ত্বরান্বিত হয়ে উঠে। বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন পাখীর সংখ্যা অধিক ও শিকারীর সংখ্যা স্বল্প ছিল তখন তন্বী, আর বিপুল শ্রোণী ভারাবনতা দুইয়েরি সঙ্গে লাস্য লীলা চলত। এখন কিন্তু মৃগয়াক্ষেত্রে একের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি, অপরটি গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম করলেই মন নিশ্চিন্ত থাকে। 20-bore এখনও আকর্ষণ-শক্তি বিহীন নয়। যে দিনে সে অনেক হতাহত গণনা করতে পারত, আমি বার বার এখনও সে পুরাণ দিনের কথা ভুলতে পারিনে, কেবলি সে পথে ফিরে ফিরে চাই। একদিন আমরা শিকার ক্ষেত্রে কিছু সকাল সকাল গিয়ে পৌঁছেছিলাম। কাজ আরম্ভ করতে প্রায় সাড়ে আটটা হল। যখন আবিষ্কার হল, আমাদের সবে পঞ্চাশটি 12 bore কার্ত্তুসের পরিবর্ত্তে ক্ষীণশক্তি বহুতর কার্ত্তুষ এসেছে তখন মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন হয় নি। প্রতিপদে কখনো একক কখনো বা বহু সঙ্গী সাথী নিয়ে পাখীরা উড়ে উঠে আমাদের মন মুগ্ধ করে ছিল। বুঝলাম আজকের দিন বৃথা যাবে না। সেদিন 20-bore আমাদের এমি মন যুগিয়ে চলেছিল, হাত আমাদের এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল, যে দিনের শেষে দিনের ফলাফল গণনা করে মোহ আমাদের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল। স্নাইপ শিকারের বিশেষ একটি মোহিনী শক্তি আছে। শিকারীর মন এতে পরিতুষ্ট হয়, তবে শার্দ্দুল ভল্লুকাদির বিপজ্জনক শিকারই মৃগয়া ক্ষেত্রে প্রথম পদবী পাবার যোগ্য। স্নাইপ শিকারে চোখেরও হাতের চতুরতার যে শিক্ষা হয় তা অন্যত্র হওয়া অসম্ভব। যদিও আগেকার মত এদের সংখ্যা বহুতর নয়, তবুও প্রতি বৎসরই কাছাকাছি সকলেই এদের নাগাল পেতে পারে। এই সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে শুধু নিজের সময় দিলেই চলেনা, নিজেকেও দিতে হয়। "পাপে মৃত্যু", এ প্রবাদ ভুললে সবই মিছে হয়। জীবন সুন্দর সংযত রাখতে হয়; নইলে সবই ব্যর্থ। বালক বয়স হতেই না দেখে বন্দুক ভরতে, আর দুচোখ খুলে তীর ছুঁড়বার মত করে বন্দুক ছাড়তে অভ্যাস করা ভাল। এতেই পূর্ণ নৈপুণ্য লাভ হয়, এতে চলন সই রকম কৃতিত্ব লাভ করে, একটা লাগল, অন্যটা ফসকাল দেখে, ওঃ যাঃ করতে হয় না।

অনেক শিকারী, দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের সংখ্যাও বড় কম নয়, অসাবধানতাবশতঃ স্নাইপ মারতে গিয়ে মাঝে মাঝে আশে পাশে ক্ষেতে যারা কাজ করে কিম্বা গরু চরায় তাদের গায়ে ছররা বিঁধে ব্যথা দিয়ে থাকেন। সে জন্যে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না বরং গৌরব করে থাকেন। বেশ খাতির নদারৎ ভাবে বলতে শুনেছি মাদ্রাজে এ অবস্থায় এক ছররার জরিমানা চারি আনা মাত্র। যিনি এই জরিমানা ধার্য্য করেছেন, তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছা হয়, আর টাকা দুয়েক দামের এই গুলিকাধারা তাঁর শরীর খানিতে প্রবেশ করিয়ে দিলে মুখখানায় কি ভাবের অভিব্যক্তি হয় জানতে ইচ্ছা করে। দেহের কোন প্রদেশে এ পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, সেটা স্বয়ং নির্ব্বাচন করবার স্বাধীনতা তাঁকে দিতে আমরা সম্মত আছি। শ্রীযুক্ত ল বন্দুকের অসাবধান লক্ষ্যের ফলে কেমন করে তাঁর ডান চোখটি হারান সে দুঃখের ঘটনা আজও আমার মনে আছে। এখান হতে অনতিদূরে মাঝ-বাংলায়

কিছু দিন আগে আর একটি দুর্ঘটনার কথা আজও ভুলতে পারিনি। ভাগ্যবলে আমার ঘাড়ের বাঁদিকে একটা জোর চাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু লাগেনি। দোষের মধ্যে না জেনে শুনে আমি আগ্রা অঞ্চলের একজন বড় কর্ম্মচারীকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা স্নাইপ উড়ে উঠল। সে ব্যক্তির শিকারের ধরণ দেখে আমি একটু পিছু হয়েইছিলাম। গুলি আমার গায়ের চামড়ায় ঢুকতে পারেনি সত্যি, কিন্তু আমার কোট আর কামিজের আস্তিন দুই ফুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ছেলে বেলায় পাঠশালে গুরু মশায়ের চড়টা চাপড়টা লভ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য সে স্পর্শ একেবারে "পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে নয়"। স্বয়ং তার পুনরাভিনয় আর কামনা করিনে। তবে এই সব বীর পুরুষের গণ্ড দেশে তার পুনরাবৃত্তি দেখলে মনটা বেশ একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে সন্দেহ নাই।

তার খুল্লতাতের দৃষ্টান্তে আমরা তাকে boy বলে' ডাকতাম। আইরিশ বংশজাত ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর ছিল। বিলাইতী ব্যারিষ্টার, শিকার ক্ষেত্রে না হলেও অন্যত্র খুল্লতাতের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গাজর ক্ষেতে Partridge মারতে গিয়ে তিনি একবার গুলি দিয়ে boy এর পায়ের ডিমের গভীরতা পরিমাপ করে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। দৈবাৎ আইরিশ রক্তপাত হয়েছিল সত্যি, তবু boy সুবিধা খুঁজতে লাগল। প্রায় আশী গজ দূর হতে ভ্রাতষ্পুত্র পিতৃব্যের খোস-মেজাজের দানের প্রতিদান দিতে ভুললনা। আর একই সঙ্গে যে Partridgeটা সারাদিন ধরে কোটের পকেটে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেটি যতদূর সম্ভব সেইদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ক্রীড়াক্ষেত্রে কিম্বা ধর্ম্মাধিকরণে যেখানেই হোক দুখানি নির্ম্মল হাত নিয়ে আসা কর্ত্তব্য। এই হচ্ছে নৈতিক বিধান। Boy সেই মহাজন পন্থার অনুসরণ করে, আমার মতে উচিত কাজই করে ছিল।

আমার বালক বয়সে, আমি একবার অভিজাত মৃগয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অভিযান করে, কোন রূপে হত্যাকাণ্ডের হাত এড়িয়ে এসেছিলাম। তারপর হতে ঘরপোড়া গরুর রক্তসন্ধ্যায় ভয়ের মত আমি এ বিভীষিকা বাঁচিয়ে চলি। প্রায়ই এই রকম জাঁকাল শিকারে আর যাইনা। এ রকম জায়গায় পিছিয়ে পড়ে থাকতে হয়। যাঁদের পদপদবী বড়, তাঁরাই ভাল জায়গাগুলি অধিকার করে বসেন। আর শিকারীরা মনোযোগের সহিত নির্ভুল ভাবে সেই দিকেই সব শিকার তাড়না করে প্রেরণ করে।

হাঁস শিকার।

অনেক দিন দারুণ রৌদ্রে স্নাইপ শিকারের পর আসন্ন শীতের স্নিগ্ধ দিনগুলি যখন হাঁস শিকারের সম্ভাবনা নিয়ে আসে তখন আরামের নিশ্বাস না ফেলে পারা যায় না। মানস সরোবরের যাত্রী এই সব হংস কারণ্ডব স্বল্পদিনের প্রবাসী, এদের শিকার-সংকার তাই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এখন দেখছি সংখ্যায় এরা দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। পূর্ব্বে আমাদের নিকটবর্ত্তী ঝিলে আর বিলে এই জাতীয় পাখীর মেলা বসে যেত। হাঁস, লাল সেরা, পিইংহাঁস, নীল-শীর আরো যে কত জাতের চিত্র বিচিত্র "বিহঙ্গম স্বর্ণ বর্ণ কেহ" তাদের বর্ণ ও জাতি গণনা ও বর্ণনা করা কঠিন ছিল। শীষ-দেওয়া Teal কিম্বা Teal হাঁসদের দিকে আমরা চোখতুলে দেখতামই না। নীল-পাখা টীল, এম্নি ঝাঁক বেঁধে এত বেশী সংখ্যায় উড়ে উঠত, তাদের পাখার শব্দে মনে হত বুঝি একখানা ষ্টীমার আসছে। সন্ধ্যার গোধুলি লগ্নে, কণে বউএর মত লাল পোষাকপরা লালসেরা বাড়ীর কাছ

পথে এত নীচু দিয়ে উড়ে যেত, যে দু এক গুলিতেই অনেক দিনের জন্য মাংসের অভাব দূর হ'ত। আমি আমাদের ঝিল এই জাতীয় পাখীদের জন্য আশ্রমের মত নিরাপদ করে রেখেছি। নিজেও মারিনে, কাউকে মারতেও দিইনে। কিন্তু তবুও দেখছি বংশ বৃদ্ধি না হয়ে লোপের দিকেই চলেছে। তাই ভাবি এরা উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলেই মারা পড়ছে। মড়কের মত নিষ্ঠুর বেগুনি রংএর পদ্মপানার অত্যাচারে এ সব জলাভূমিতে পাখীদের খাদ্যোপযোগী গুল্ম কিম্বা ওষধি জন্মে না, বরং মারা পড়ে। তাই এই দুর্দ্দশা।

রাজহাঁসও ছিল অনেক, তাঁদের খুজে ফিরে ব্যর্থমনোরথ হতে হ'তনা। লুকিয়ে বসে থেকে ছোট্ট ডিঙ্গী পাঠিয়ে জল নাড়া দিলে তারা কোন পথে উড়ে ওঠে সেই টুকু লক্ষ্য করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ত। পদ্মার চড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে গিন্নী ঠাকুরুনদের মত যেন পিঁড়ি পেতে বসে থাকত আর কর্ত্তা ব্যক্তিরা ভাঙ্গা গলায় ব'কে ব'কে ঘুরে বেড়াত। একবার তাদের যাত্রার ধীরগতি দৃষ্টি গোচর হলে উঁচু চড়ার নীচুতে গা ঢাকা দিয়ে বসে এত সংখ্যায় সংগ্রহ করে আনতে পারতে যে তোমার শিকারী মন খুসী হয়ে যেত। খাবারের খোঁজে তারা নিশাচরবৃত্তিতে অভ্যস্ত। সেই সময় যখন ধানের ক্ষেতে আহারে নিযুক্ত থাকে, চাঁদের অনির্দ্দিষ্ট আলোকে শেষ রাতের দিকে অনায়াসেই ধরা পড়ে। আমার এক পিতৃব্য-পুত্র 4-Bore বন্দুক দিয়ে এদের ভিড়ের মধ্যে একবার একটা গলিপথ কেটে গিয়েছিলেন, যদিও ব্যূহ রচনাটা জর্ম্মানদের মতই জমাট ছিল। এ কীর্ত্তির পুনরাবৃত্তি আর ঘটতে দিই নি। আমি একবার ফাল্গুনের প্রভাতে পদ্মার উপর দিয়ে প্রায় সহস্রাধিক হাঁসকে ফিকে বেগুনি আকাশের গা বেয়ে নিষ্কম্প পক্ষে উড়ে আসতে দেখেছিলাম। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য জীবনে কখনো ভুলতে পারবনা। ফাঁকা খোলা জলাশয়ের উপর দিয়ে রাঙা আঙরাখাপরা লালশেরা যখন দলে দলে ভেসে আসে আর সামান্য বিপদের আশঙ্কায় তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে সরে পড়ে, সে বড় সুদৃশ্য। লাল পাগড়ী পরা এই জাতীয় পাখী ঝাঁকে বড় হয় না। ঘাসে-ঘেরা পদ্মবনে এদের খুঁজে বার করা কঠিন কাজ॥ শ্বেত-চক্ষু হাঁস কঠিন-প্রাণ পাখী, শরবনে এদের শিকার করায় যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায়। এরা দুটো কি তিনটে এক সঙ্গে উড়ে ওঠে। আর যখন ঘাসের মাথা ছাড়িয়ে যায় তখন ডাইনে বাঁয়ে দুধারেই গুলি চালাতে পার। আহত পাখীকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে এ দেশে থামবার দরকার হয় না। তোমার জেলে মাঝি তার বহু-ফলা মাছধরা কুঁচ দিয়ে তাদের আটক করবার আশ্চর্য্য কৌশল জানে। তার সুশিক্ষিত চোখ, জলের উপর সামান্য বুদ্‌বুদ কি ঢেউ দেখে, জলের নীচে পাখীটা কোথায় আছে সহজেই অনুমান করতে পারে। আমি দেখেছি এরা সহজেই ঘাস বনে লুকান পাখীকে ঠোঁট ধরে টেনে বার করে আনে, ভেসে-চলা পদ্ম কি অন্য জলজ পাতার ফুলে-ওঠা আকৃতি দেখে পাখী যে কোন খানে আছে অনায়াসেই আবিষ্কার করে ফেলে।

ভারতবর্ষীয় হাঁসদের মধ্যে ত্রিশূল দেখতে সব চেয়ে সুন্দর। যখন উড়ে ওঠে আকাশের গায়ে ত্রিশূলের মত দেখায় বলেই তার ঐ নাম বাংলা দেশে প্রচার। নরম মেজাজের পাখী অল্প জলেই খেলতে ভালবাসে—গভীর জলের প্রাণীর বিশেষত্ব তার নেই! যেমনই কঠিন প্রাণ শিকারী হোক না কেন এ পাখীর রূপে বর্ণমহিমার অলকা তিলকার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। তবে এরূপ পাখীটির পক্ষিনীর নয়। নীল-শীরা পুরুষপাখী (Teal) আর ত্রিশূল ঐ দুয়ের মধ্যে স্বয়ম্বর সভায় কে যে মালা পাবে এক নজর চেয়েই বোঝা সহজ।

সাদা Teal রা গাছের কোটরে বাসা বাঁধে দেখেছি। শুনেছি ভাঙা বাড়ী, ঘরের দেয়ালের ফাঁক, কার্নিসের কোণও এ উদ্দেশ্যে বেছে নেয়। শীষ দেওয়া Teal রা এদের মত দেশান্তরে প্রবাস যাত্রা করে না—বারো মাসই এক গাঁয়ে কাটায়। তাই তাদেরি মত সাদাসিধা গেঁয়ো ধরণের জীব। এই কারণেই এদের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নেই।

কি ভাবে হাঁস আর Tealদের সম্মুখীন হতে হয়, চতুর রাজ হাঁসকে ঘেরাও করতে হয়, সে সব উপায় তুমি সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। তারা কি আবার প্রকারের ঝিল বা জলাশয়ে বসবাস করে সেটা জানা থাকলেই কাজ কঠিন হবে না। তবে তুমি যেমনই নিপুণ শিকারী হও না কেন আর তোমার অস্ত্রটি যেমনই দামী হকনা কেন, পাড়া গাঁয়ের শিকারী, যাদের এই ব্যবসায়, যারা এই করেই খায়, কখনই তাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। সে যে মাথায় ঘাসের চাবলা ঢাকা দিয়ে সম্মুখে পদ্ম প্রভৃতি জলজ ফুল পাতা শেওলার চলন্ত ঝাপ ঠেলে ঠেলে এক পেশে ভাবে কাঁকড়ার মত, নিঃসন্দিগ্ধ পাখীদের একেবারে কাছে গিয়ে পৌছায় আর ঝাঁকে ঝাকে মেরে নিয়ে আসে,—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমি কতকগুলো Spoonbill আর Shoveller (পাটাবুকো হাঁস) আমাদের বাড়ীর পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। Spoonbillটার ডানা ভাঙা ছিল, অন্যগুলি উড়ে না পালাতে পারে বলে তাদের ডানার পালক কেটে দিয়েছিলাম। ডানাভাঙা পাখী অস্ত্রচিকিৎসায় অল্প দিনের মধ্যেই আরাম হয়ে উঠল; কিন্তু তাকে এতটা সুস্থ সবল হতে দেওয়া হল না যে পালিয়ে যেতে পারে। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের লাজুক বন্যপ্রবৃত্তি কেটে গেল সত্যি, কিন্তু কিছুতেই তারা পোষা হাঁসদের সঙ্গে 'চল-চল' মেনে নিলেনা। রাতেও পুকুরে থাকত, বাদলা দিনে কেবল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠত। শীতকাল এলে ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল, ডানা-ভাঙা পাখীটি ছাড়া আর সবাই এদিক ওদিকে উড়ে চলে যেতে আরম্ভ করলে, যদিও দিনের বেলায় আবার সবাই ফিরে আসত। বসন্তকাল আসবা মাত্র ডানা ভাঙা পাখীটিকে একা ফেলে সবাই পালিয়ে গেল। পরের আশ্বিনে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে তারা ফিরে এসেছিল। নবাগত গুলি বোধ হয় তাদের পুত্রকন্যা। আবার বসন্ত আসবার আগেই আমরা অন্যত্র চলে গেলাম। কাজেই যথাকালে তারা মানস পথের যাত্রী হয়েছিল কিনা সে সংবাদ জানবার সুযোগ ঘটেনি!

প্রবাস যাত্রা করতে নীল শীরা হাঁসের সব চেয়ে বেশী দেরী হয়। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়েও এ হাঁস আমি অনেক বার শিকার করেছি। সেই রৌদ্র প্রখর দিনে এদের নীল আঙরাখা গুলি আরো উজ্জ্বল হয়ে সাটিনের মত ঝক্ ঝক্ করে। সেবার আমরা শিকারী তিনজন ছিলাম। জল এত কমে এসেছিল যে অনেক জায়গায় ভেলা ভাসান চলেনি, হেঁটে পাড়ী জমাতে হয়েছিল। সেদিন আমাদের যা লভ্য হয় তাতে মন খুসী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডাঙায় উঠে হাঁটু হতে পা পর্য্যন্ত কিযে যাতনা আরম্ভ হয়েছিল সে কথা আমি কখনো ভুলে যাব না। একজন কৃষকের টোটকা ওষুধে আরাম পেলাম। এর আগে কিম্বা পরে আর কখনো এমন হয়নি। যেখানে যাতনা হচ্ছিল সেখানটা সাবান ও গরম জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে অনেকখানি সরিষার তেল দিয়ে যেন প্রলেপ দিলে। বন্ধু দু জনেই বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁদের এ দুঃখ পেতে হয়নি বলে তখন আমার প্রতি প্রায় কোন সহানুভূতি দেখাননি। পরদিন কিন্তু তাঁদেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটল, ("চিরদিন কখনো সমান

না যায়", মানুষ সে কথা মান্‌তে চায়না)। রাতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে সারাটা রাত ভোর দুঃখ দিয়েছিল। পরিণাম স্মৃতিও সুখকর হয়নি।

তরুণ বয়সে মেজদাদার নিত্য সঙ্গী হয়ে যখন ঝিলে বিলে দিনের পর দিন হংস কারণ্ডবাদের বিচরণ ভূমিতে অশ্রান্ত উৎসাহে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় ঘটিয়ে বেড়াতাম সেই সব দিনের স্মৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। একদিন আমরা বাড়ী হতে বহুদূর গিয়ে পড়েছিলাম। স্থির ছিল সন্ধ্যার প্রাকালে ফিরে আসব কেননা যে জঙ্গলের পথে আমাদের সওয়ার হয়ে ফিরতে হবে তারি আশে পাশে একটি চিতাবাঘ ভারি উপদ্রব করে ফিরছিল। মাঘের প্রারম্ভ, আকাশ মেঘ লেশ হীন, দিনগুলি সূর্য্যালোকিত, চমৎকার রমণীয়। দুটি দেশী টাট্টু আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আমি বেলা থাকতেই ডাঙ্গায় উঠেছিলাম, দাদা কিন্তু অনেকদূর গিয়ে পড়েছিলেন। কতকগুলি রাঙা ঠোঁট,সাদাগলা,সবুজ চূড়া বাঁধা হাঁসের (mergenser) পিছু নিয়ে ছিলেন। এ জাতের পাখী এদিকে বড় বিরল। যখন আমার প্রলুব্ধ চোখের সম্মুখে এক-জোড়া এই সুন্দর হাঁস সগর্ব্বে দেখাতে দেখাতে বিজয়ীবেশে ফিরলেন তখন সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন, আলোর স্রোতে ভাটা পড়ে আকাশ ঘোরালো হয়ে আসছে। সোয়ার হতে দেরী হল না। আমরা টাট্টু ছুটিয়ে চললাম। একজন শিকারী আর একজন মাঝি দুজনে দুই ঝুড়িতে আমাদের শিকার লব্ধ হাঁসগুলি বয়ে নিয়ে চল্‌ল। রাতের অন্ধকার আগবাড়িয়ে ছিল, বনের পথে যেতে যেতে আলোর আর এতটুকু বাকী রইল না। পথ ঘাট গাছ পালা সব যেন কালীর দহে ডুব দিলে। পথে বেশী গাছ পালা ঝোপ ঝাড় ছিল না। বেশীর ভাগ খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে ঘন আমবন। এ পথে এলে এমন দিন যেত না যেদিন না দেখতে পেতাম বুনো বরার দল আশে পাশে ধানের ক্ষেতে তাণ্ডব করে ফিরছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমাদের দিকে দেখত। টাট্টু দুটো ভয় পেত না আমরাও কিছু মনে করতাম না। আমরা বেশ খুশ মেজাজে বাহাল তাবয়তে চলেছিলাম। হঠাৎ আমাদের বাঁদিকে সম্মুখে ঘাসের বনে খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। টাট্টু দুটি আর এক পাও নড়লনা আর থর থর করে কাঁপতে লাগল, অন্য পথে ছুট দিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। মুহূর্ত্তের জন্য শব্দটা থেমে গিয়ে আবার আরম্ভ হল। যদিও অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবুও ঘাসের মধ্যে শব্দের অনুমানে বুঝতে পারলাম একটা বিপুল-বপু জন্তু অন্য পথে চলে গেল। টাট্টু দুটি আমাদের পায়ের ইসারায় আবার চলল। তবে সাবধানের বিনাশ নাই মনে করে আমার বন্দুকে ৫নং এর কার্ত্তুজ ভরে নিলাম। একশ হাত যেতে না যেতে আবার সেই ভয়ানক শব্দ হল। আমাদের বাঁ দিকে, বেশী দূরেও নয়, তাই অধিক না ভেবে চিন্তে আমার শব্দভেদী অস্ত্র ছাড়লাম। ঝোপের মধ্যে খুব একটা হুড়ুহুড় শব্দ হল তারপর জন্তুটা পালিয়ে গেল। আমার টাট্টু তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। টাট্টু হতে নিজেদের উদ্ধার করে নিয়ে লাগাম ধরে খুব কাছাকাছি হয়ে হেঁটে চললাম। সমস্ত পথ মনটা তারেবাঁধা যন্ত্রের মত যেন একেবারে টান হয়ে রইল। সে এক অদ্ভুত ভাব। কেবলি মনে হতে লাগল কে যেন আমাদের পাছু ধরে চলেছে, আর তার মতলবটা মোটেই ভাল নয়।

সে অদৃশ্য শত্রু যে বাঘ সেটা পরে জানা গেল। টাট্টুরা তাদের জন্মগত সংস্কারবশে যে বিপদ অনুমান করেছিল তাতে ভুল হয় নি। এদের এ সংস্কার যে কত অভ্রান্ত তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার waler ঘোড়া "শঙ্কর" জীবনে কখনো বাঘ কি চিতা দেখেনি। শুধু যে সে নিজে দেখেনি তা নয়, তার চৌদ্দপুরুষে অষ্ট্রেলিয়া দেশে কেউ কখনো দেখেনি। তবু যখন একবার একটা মরা-বাঘ

শিকারীরা বয়ে আনছিল তখন তার গন্ধে সে ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল! তার চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা শোন। একবার গুটিকত মরা বাঘের চামড়া বারন্দার একধারে শুখতে দেওয়া হয়েছিল। বাগানে গুটি কত হরিণ চরছিল। সেখান হতে চামড়া তারা দেখতে পায়নি। শুধু গন্ধের প্রভাবে ভয়ে তাবা কেঁপে কেঁপে চীৎকার করে উঠতে লাগল। অলকমণি, তোমার পোষা হরিণশিশুরা কেন অমন করছে জান্‌বার জন্যে তোমার ভারি কৌতূহল হয়েছিল। কল্যান আমার কাছে জেনে নিয়ে "সব-জান্তা" ভাবে সকলের কাছে খবরটা দিয়ে বেড়াতে লাগল। এ হরিণগুলি এত ছোট বেলায় বন ছেড়ে এসেছিল যে তখন তাদের দুগ্ধপোষ্য অবস্থা। বাঘের চামড়ার ব্যাপার যখন ঘটে তখন সবে ঘাস খেতে শিখছে।

শূকর-শিকার।

Polo হচ্ছে খেলার রাজা, আর বরাহ-শিকার সেরা শিকার। এর ও রাজ-পদবী। তাছাড়া এই দুই হচ্ছে রাজাদের খেলা আর শিকার। বয়স যখন তরুণ ছিল, তখন এদুই খেলা খেলবার মত ভরা থলি ছিল না, আর যখন বয়স পুরাণ হয়ে এল তখন যৌবনোচিত খেয়াল ছাড়তে হ'ল। Tent club (তাঁবু-সমিতি) এখন অতীত ইতিহাস। রাসায়নিক নীলের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যান্য নানা কারণে নীলকর জাতি অন্তর্দ্ধান হয়েছে। ভদ্র ইংরাজ অভিজাত বর্গের স্থান জবরদস্তি দখল করেছে জর্ম্মান, য়িহুদী আরও বহুতর বিদেশী। অবস্থা তাদের ভিন্ন, মনোভাব অন্য বর্ণের, আর আদর্শ স্বতন্ত্র। সেকালের মত যে দুচার জন দিলদরিয় ইংরাজ ভদ্রলোক এখনও বর্ত্তমান, তাঁরাও মৃগয়া প্রীতি ও ক্রীড়া কৌতুক বর্জ্জিত; স্বজাতীয় ভাই বন্ধুর সঙ্গে এমন মিলে মিশে হারিয়ে গেছেন যে তাঁদের পুনরুদ্ধার করে শিকারীর দলে টেনে দল-পুষ্ট করবার চেষ্টা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনের" মতই হাস্যকর। বাঘ-ভালুক মারা পুরুষোচিত ব্যবসায় আর তাঁদের নেই, তাস পাশার মোহ মৃগয়ার আনন্দকে গ্রাস করে বসে আছে। দেশের প্রজার সঙ্গে যে প্রীতির বন্ধন আগে ছিল তা শিথিল হয়ে খসে পড়েছে। এখন গ্রামের নিরক্ষর চৌকীদারই হচ্ছে স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জ্জনের প্রধান উপায়—তাঁদের শিক্ষা-ভাগীরথীর গোমুখীর উৎস! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম পিশে দিন কাটান, অবান্তর ও অমূল বিবরণী লিখে ও সরকারে পেশ করে কালক্ষেপ করেন। তার চেয়ে যদি "ঘোড়া পর জিন" এঁটে বরাহ অবতারের ছিন্নশীর্ষ বর্ষাফলকে গেঁথে, নূতনতম আগ্নেয়াস্ত্রের সদ্ব্যবহার করে', বন্য ও গ্রাম্য পথ পরিদর্শন ও পরিভ্রমণে হাতে বন্দুকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান রাশি সঞ্চয় করতেন, তাহলে আর কিছু না হক পথ ঘাট গুলোর সংস্কার হত—প্রজার চলাচলের সুবিধা ঘটত। আধুনিক সরকারী ডাক্তারগণ প্রায়শঃই পড়া পুথির সাহায্যে বন্দুক ও বর্ষা আঘাতের সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন, অথচ এ দুই অস্ত্রের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকে কিনা সন্দেহ—নিয়মের ব্যতিক্রমই কিনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই দু একজন ভিন্ন গোত্রের নিশ্চয়ই আছেন—তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁদের সম্মুখে নিবেদন করে দিয়ে, আমার মত ব্যক্ত করছি, সে কথা জানিয়ে রাখাই ভাল।

আইরিশ জাতীয় কোন কমিশনার, তাঁর শাসনাধীন প্রদেশে ও তাঁর আয়ত্তাধীন কাজের মধ্যে, অশ্বারোহণে অপটু আর বন্দুক চালনায় অনভিজ্ঞ কোন কর্ম্মচারীকে প্রবেশাধিকার দিতেন না। বলা বাহুল্য আমি এঁর সঙ্গে অভিন্ন হৃদয় ও সম্পূর্ণ একমত!

সে যাই হোক, আজকালকার দিনে যে সব চা-কর কি নীলকর এখন জমিদার হয়ে বসেছেন, দু একজন আইন ব্যবসায়ী কিম্বা ধনী বণিক ভিন্ন আর কোন ইংরাজের শিকারে বড় একটা উৎসাহ দেখা যায় না। স্থানীয় আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একবার বাৎসরিক ক্রীড়া কৌতুকের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে অনেকে ভীত হয়ে উঠেছিলেন যে এর মধ্যে বোধ হয় বয়স্ক ধনী আইনজ্ঞদের ধনে প্রাণে মারবার কোন দুরভিসন্ধি নিহিত আছে। আমার বরাহ শিকার সম্বন্ধে জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে কাজের সময় নানারূপ বুদ্ধি বিচারের জন্যে তোমায় অপরের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তবে এই মাত্র বলতে পারি, এ মৃগয়ার মত মনোমুগ্ধকর দীক্ষা আর খুজে পাওয়া ভার। যদিও শাস্ত্র মতে এটি ব্যসন।

এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে দু একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছিনে। যদিও চতুর বরাহ বীরই পরাভূত হয়েছিল তবু এ বিয়োগান্ত নাট্যের দু একটা গর্ভাঙ্কে বিশেষ হাস্য রসের আবির্ভাব হয়। বড় বড় বরাহ শিকারী, যথা প্রথিতযশা Simpson, Baden Powell প্রভৃতি, এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সমস্ত পড়ে আমি পরিপাক করেছিলাম, আর মনে মনে স্থির নিশ্চয় ছিল যে Brodraj অপেক্ষা Simmy তদপেক্ষা Bayonet কি উৎকর্ষ প্রকাশ করে সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা প্রচার করব। আমার সঙ্গীরা কিন্তু এদের মধ্যে কিছুরি অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেনি। খোলা মাঠের খেলা। প্রথম বরাহ যখন দেখা দিল তখন সকলেই মনে করেছিল তার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারা যাবে। আমি জিন সোয়ার হলাম, আরো দু জন সাথী ছিল ; (I sprang to the stirrup & Joris & he। শুধু তার নাম Joris ছিল না)। আমরা দৌড় দিলাম। উত্তম মধ্যম প্রথম পুরুষ সবাই মিলে দৌড় দিলাম (I galloped, Dick galloped, we galloped, all three)। মধ্যমের নাম যদিও Dick ছিল না। আমরা একটী বরাহ বীরের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমার সঙ্গীদের ঘোড়া ছিল ভাল, তাঁরা এগিয়ে গেলেন। ঘোড়ার গুণে নাহক স্ফুর্ত্তির জোরে আমিও সত্বর অগ্রসর হলাম। সেদিন শিকারের নিয়মাবলি আমার মত কেউ পরিপালন করেনি। (ক) শূকরের যত কাছাকাছি থাকতে পার ততই ভাল ; আমি টাট্টুকে বাধ্য করে যত কাছে যাওয়া সম্ভব, তাই গিয়েছিলাম। (খ) শূকর-শাবক যেখানে যায় ঘোড়াও সে পর্য্যন্ত অনুসরণ করতে পারে। (গ) ঘোড়া কোথায় পদক্ষেপ করবে সে সম্বন্ধে সে নিজেই সতর্ক হবে, তোমার ভাববার আবশ্যক নাই। আমি ঘোড়ায় চেপে বসলাম, বীরাসনে দৃঢ় হয়ে রইলাম। মহাজনের আদেশ উপদেশ যখন জানা আছে তখন মাভৈঃ। ঘোড়াই সব কর্ত্তব্য পালন করবে। মাঠের মধ্যে একটা গর্ত্ত ছিল—শূকর লম্ফ দিলে, স্বাধীন অশ্বরাজও ঠিক তাই করলেন, সওয়াররূপ দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধ হতে শূকরের পৃষ্ঠভাগে খসে পড়ল। সে তখন খোলা জলে হাবু ডুবু খাচ্ছিল। আমি স্বায়ত্তশাসন নিজ অধিকারে নিয়ে নিপান হতে প্রাণ রক্ষা করলাম। সময় ও অবস্থার অনুযায়ী যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসলাম। মধ্যম পুরুষ ততক্ষণে শূকরের সন্নিকট হলেন, প্রথম পুরুষও অধিক দূরে ছিলেন না, কেবল উত্তম পুরুষ, অহং, পিছে পড়ে মিছে হয়েছিলাম। চক্ষেরপলকে শূকরটি ফিরে মধ্যমের ঘোড়াকে নির্ঘাত দন্ত প্রহার করলে। শাস্তি স্বরূপে তার গায়ে বর্ষাফলকের একটু আঁচড় লাগল মাত্র। তারপর সে প্রথম পুরুষের দিকে মনোযোগ করলে। তাঁর শিক্ষিত ঘোড়া অবলীলাক্রমে শূকরটিকে ডিঙিয়ে গেল। তিনিও তার পশ্চাদ্দেশের উরু শীর্ষ ভাগে বর্ষাখানিকে নিবদ্ধ করে রেখে চলে গেলেন। এবার

আমার পালা। বরাহরাজ এতক্ষণে একেবারে উন্মত্তপ্রায়, সমস্ত মুখ ব্যাদান করে গুরু বর্ষায় ভারে বিপন্ন, ছন্দোবিহীন আন্দোলিত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বাঙ্গলাদেশের মান তখন আমার হাতে। পঙ্কিলনিপান হতে আত্মোদ্ধার করেও আমি কি সম্মান পদবী লাভ করব না? এও কি একটা কথা! কেমন করে যে সম্ভব হল বলতে পারি নে। পা তুলে' ছিলাম কি নামান ছিল মনে নাই, আমার বর্ষা ফলক কিন্তু, সে লাফিয়ে আসবা মাত্র,তার গলাহতে স্কন্ধদেশ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল, আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। ঘোড়ার একটু বাঁকবার জন্যে, আমার একটু হাতের কৌশলে কিম্বা বরাহের বেয়াকুবিতে ঘটনাটা ঘটল জান্‌তে পারলাম না। আমি যখন ঘোড়া চাবকে ফিরে দাঁড়ালাম তখন শূয়রও দাঁড়িয়ে আছে—গলা দিয়ে উৎসধারে রক্ত ঝরছে। তবু সে শেষ পর্য্যন্ত হার মানেনি, খাড়াই ছিল। যমদণ্ডের দুরন্ত আঘাত অতঃপর তাকে ধরাশায়ী করে দিলে। সেদিন আরো বরাহ মারা পড়েছিল, কিন্তু প্রথম বর্ষা-নিক্ষেপের সম্মান আমাকে পরে অন্যত্র সঞ্চয় করতে হয়েছিল। আর একটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একটি শূকর লম্ফ দিয়ে নালায় পড়েছিল। নালার পাড় একেবারে খাড়া। সে পথে পলায়ন তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যে পথে নেমেছিল, সেই পথে ফেরা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। তাকে অন্য পথে ফেরাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আগে যেমন জাল ও বর্ষা নিয়ে শূকর-শিকারে যেতাম সেই উপায় অবলম্বন করে ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে চললাম। অন্যেরা ঘোড়ায় যাবেন বলে পিছে রইলেন। আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে সে ধৈর্য্যের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিল; একেবারে বায়ুবেগে এগিয়ে এল। সে ভালই হয়েছিল, বর্ষা তার অন্তর ভেদ করলে। সেও অবিলম্বে নালায় পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল! বেচারী H. L, বহুপূর্ব্বে সে পরপারের যাত্রীদের সাথী হয়েছে; শারীরিক অক্ষমতার জন্যে ঘোড় সওয়ার হতে পারত না, হেঁটেই আসছিল। যখন আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে উৎসাহের সুরে বল্লে, "সাবাস", তখন জয়গর্ব্বে আমার বুকটা একেবারে ফুলে উঠল।

পলাশী ক্ষেত্রে যে বরাহ শিকার দেখেছিলাম সেটা উল্লেখ না করলে আমাদের বারের (Bar). অবিচার করা হবে। এ রঙ্গাভিনয়ের নায়ক একজন সমব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার। সব খুঁটিনাটি বর্ণনা জোগাড় করা অসম্ভব, তবে যতটুকু প্রকাশ ও যত খানি গোপন ছিল তাহাতে অনায়াসে বোঝা গেল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই অশ্ব ও অশ্বারোহীর সখ্যবন্ধন ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হয়ে বিপুল শব্দে তিনি বরাহ অবতারের পৃষ্ঠভাগে অবতরণ করেন। যেরূপ গভীর ভাবে আপন পদবী সেখানে প্রোথিত করে প্রথিতযশা হয়েছিলেন, অদ্বিতীয় ক্লাইভ ও গুরুভার কামানের সাহায্যে ততটা সক্ষম হন নাই। অত্যান্ত বরাহ পরিবার আবাল বৃদ্ধ বণিতা সেই স্মরণীয় প্রাতঃকাল হতে আর সে পথে কখনো যাতায়াত করেনা। সেই হতে তিনি অশ্ব ও অশ্বারোহীর সম্বন্ধ বিচ্যুতির মামলা ছেড়ে অন্য রূপ সম্বন্ধভ্রংশের মামলায় মনোযোগ করেছেন। এতে তাঁর অর্থ ও যশ দুই প্রচুর রূপে লভ্য হচ্ছে।

একটা শেষ কথা তোমায় বলে রাখি। শূয়র তাড়িয়ে বেড়াবার আগে কাগজ তাড়িয়ে (paper chase) বেড়াবার অভ্যাসটা খুব পাকা করে নিয়ো। ভাল ঘোড়সওয়ার না হলে শূকর শিকার শক্ত ব্যাপার, একথা ভাল করে মনে রেখো।

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শিকার ব্যাপারের মোহিনী শক্তি চিরন্তনী। এ সম্বন্ধে আমি Tennyson'এর ছোট্ট নদীর (Brook) মত অনবরত অনর্গল বকেই যেতে পারতাম। কিন্তু আপাততঃ শিকার ছেড়ে হাতিয়ার সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা বলে' এ পর্ব্ব সমাধা করা ভাল। সব রকম শিকারে সব সময়ে কাজে আসে এমন এক রকম বন্দুক পাওয়া সম্ভব নয়। বহুকাল হল আমি কালা বারুদের বন্দুকের সঙ্গে ফারখতি করেছি, সেই জন্যে আর তাদের দোষগুণ বিচার করব না। Cordite (নির্ধূম বন্দুক) তার স্থান অধিকার করে বসেছে, আর যে সহজে স্থানচ্যুত হবে তার সম্ভাবনা কম। এর প্রধান সুবিধা এই যে; গুলির ফলাফল তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও। আর পায়ে হেঁটে শিকার করতে হলে এই আগ্নেয়াস্ত্রটি সব চেয়ে নিরাপদ। লতাগুল্মসমাকীর্ণ পথে, কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন দিনে, বারুদের ধোঁয়ায় চারিদিক আরো যদি অন্ধকার হয়ে আসে, তাহলে পদব্রজে মৃগয়া যথার্থই ব্যসন হয়ে দাঁড়ায়। এই ধোঁয়ার প্রকাশে তোমার আশ্রয়স্থান আর গোপন থাকে না, বাঘ কিম্বা চিতা, মহিষ অথবা ভল্লুক, তুমি তাদের ভাল করে দেখাবার সুযোগ পাবার আগে, তারাই তোমায় দেখে ফেলে; আঘাতের পরিণাম কি হল তুমি জানতে পারনা, ধোঁয়ায়-অন্ধকার জায়গা ছেড়ে তাই বেরিয়ে পড়া সমূহ বিপজ্জনক। বিশেষ যখন শিকার ও শিকারীর সংস্থান দূরে নয়, সন্নিকটে।

অনেকে বলেন আমাদের দেশের আবহাওয়া Cordite বন্দুকের অনুকূল নয়, তিন বৎসরের টোটার উপর নির্ভর করা চলে না, গুলি ফস্কান সম্ভব, কিম্বা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আওয়াজ হতে পারে, সেটায় বিপদের আশঙ্কা আরো বেশী। আবহাওয়ার উপর দোষ না চাপিয়ে এস্থলে শিকারীর ইচ্ছাকৃত অনবধানতার উপর দোষ দেওয়াই অধিক সমীচীন। এ সম্বন্ধে আমার কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা তোমায় বলতে পারি। আমি যখন কার্তুজ আনাই তখন যাদের কাছে কিনি তাঁদের বলে রাখি তাঁরা টোটাগুলি এমন বাক্সে ভরে সাজিয়ে পাঠাবেন, যে বাক্সে একেবারে বায়ু চলাচল রহিত। এসব আমি আবার ফ্লানেলের আস্তর-দেওয়া চামড়া কিম্বা ওক কাঠের পাত্রে ভরে' আমার water proof বন্দুকের আলমাইরায় রেখে দি। হিংস্র জন্তু শিকারে বেরবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা করে টাটকা পুলিন্দা খুলে নি, আর শিকার হতে ফিরে যা পড়ে থাকে সে সব পরে হরিণ শিকার কিম্বা আহত জন্তর গায়ে দ্বিতীয়বার মারবার জন্যে ফ্লানেলের থলিতে স্বতন্ত্র করে তুলে রাখি। এসব কাজ চাকরের হাতে ফেলে না রেখে নিজে হাতে করা উচিত। অনেকে এ বিষয়ে চাকরের উপর নির্ভর করেন, আমি করিনা, তা সে চাকর যতই বিশ্বাসী অথবা কার্য্যদক্ষ হকনা কেন। গুলি ফস্কালে শুধু যে শিকার হাত-ছাড়া হয় তা নয়, আরো কিছু দেহ-ছাড়া হতে পারে, আর গুলি যদি অনেকক্ষণ ধরে বন্দুক ছেড়ে না বেরোয় তাহলে ত বিপদ সঙ্গীন। যে সব শিকারী হাওদায় বসে' কিম্বা মাচানে চড়' শিকার করেন তাঁরা গুলি সম্বন্ধে তেমন সতর্ক কিম্বা সাবধান হন না, কেননা তাঁরা জানেন আশ্রয় অনেকটা নিরাপদ। তবে গুলি ফস্কালে কিম্বা যথাসময়ে আওয়াজ না হলে শরীর ও মন দুইই উত্যক্ত হয়ে ওঠে, এটা শিকারীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয়। আমার সৌভাগ্যের পরিচয়ে বন্ধুরা আশ্চর্য্য হন (তোমাদের "জীব" "জীব" বলা ভাল), কিন্তু এ সৌভাগ্য

শুধু আমার সাবধানতার ফল। পনের বৎসরের পুরাণ কার্ত্তুষ শুধু যে দেখতেই নূতনের মত দেখিয়েছে তাই নয়, কাজেও তাজার মত কাজ দিয়েছে।

তুমি যদি Selous কিম্বা Samuel Baker না হও, আর একটা সহজ সীমার মধ্যে আপন খেয়াল খেলাও, অপব্যয় না কর, তাহলে পঞ্চাশটি কার্ত্তুষ খরচ করে সমস্ত শিকার চালিয়ে নিতে পার। শুধু একটি নয় সমস্ত বন্দুক ব্যবহার করলেও এর বেশী আবশ্যক হয় না।

আমার মতে ৪৬৫, ৪৭০, কি ৪২৫ দোনলাকে হারান শক্ত ব্যাপার। ৪৮০ গ্রেণ গুলি এর সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তে পার। চিনকারা কিম্বা হিমালয় প্রদেশে হরিণ শিকারের জন্যে ৩৫০ ম্যাগাজিন বন্দুক কাজে লাগান চলে। যে বন্দুক এক গুলিতে শিকার ঘায়েল করে, তার লড়াই ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে সেই অস্ত্রই যথার্থ কাজের। চিক্কণ ছিদ্র (smooth bore), ক্ষুদ্র ছিদ্র (small bore) বন্দুক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, বিশেষ হিংস্র জন্তু শিকার-ব্যাপারে। এই শিকারে ব্যবহারের জন্য বহুবিধ অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে—অনেকে মনে করেন সেগুলি শ্রেষ্ঠতর, অর্থাৎ রাইফেলগুলির (Rifle) চেয়ে অধিকতর কাজের। সেকালে মসৃণ ছিদ্র বন্দুক এ ক্ষেত্রে ব্যবহার হ'ত আর বারুদের জোরে কাছে কাজ দিত, বেশী দূরে শত্রু নিধন চল্‌ত না। এখন এসব বন্দুকের স্থান অধিকার করেছে, গুলি আর ছররা ব্যবহারের বন্দুক। যদিও আমি Holland & Holland কোম্পানীর জন্যে ওকালতী করতে রাজী নই, তবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে তাঁদের Paradox বন্দুক মৃগয়া ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, এর সমকক্ষ আর নাই। আমার সোপারশীতে যে সব বন্ধু এই বন্দুক ব্যবহার করেছেন, তাঁরা সকলেই আমাকে জানিয়েছেন যে ৬০ গজের মধ্যে বাঘ ভালুক আর সাম্বর শিকার ব্যাপারে এই অস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিতা শিকারের পক্ষে 12 bore Paradox একটু বেশী বড় আর এর গুলি একটু বেশী ভারী, প্রায়ই শিকার ভেদ করে যায়। আমি একবার ত্রিশ গজ দূরে একটি চিত্রিণী বাঘিনীকে এই গুলিতে বুকে আঘাত করে শিকার করেছিলাম। মৃত্যুর পর দেখা গেল গুলি তার বক্ষ ভেদ করে, ডান কাঁধে বাধা পেয়ে চামড়া বিচ্ছেদ করে একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে পোঁছেছে—গুলির আকারের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। বন্যমহিষের উপর এই অস্ত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রমের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি—তবে সে পরীক্ষা আর দুবার করবার ইচ্ছা নাই। আমি পায়ে হেঁটে শিকার করে থাকি; অনেক সময় এত কাছে হতে করি, যে অনেকে সেটা নিরাপদ মনে করেন না; কিন্তু এসব সময়ে আমি Rifle'এর উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করি, আর প্রায় আমার সব শিকারই ৪৫০ কিম্বা ৪৬৫ নম্বর টোটা দিয়ে করে থাকি। যে গুলির সম্মুখ ভাগ নরম, সেগুলি কাছে কাজ দেয়, দূরে হলে ছুঁচল ফাঁপা-গুলি কিম্বা Velopex ব্যবহার আবশ্যক। সাম্বর কিম্বা ভালুক শিকারে একথা যতটা খাটে বাঘ ও চিতা শিকারে ততটা নয়। জন্তুটির অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এই সঙ্গে অবিলম্বে মনস্থির করবার ক্ষমতা, অভিজ্ঞ-দৃষ্টি সোণায় সোহাগা। কেননা তাহলে ঠিক কোন কোণ্ লক্ষ্য করে গুলি চালালে কাজের হবে সেটা বোঝা সহজ, ক্ষমতা লাভও নিশ্চয়। আমি বাঘ কি চিতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি প্রায়ই মারিনে, কেননা মস্তিষ্কে যেখানে আঘাত পেলে জন্তু নির্ঘাত মরে, সে পদার্থ এদের মাথার পশ্চাৎ ভাগে থাকে। তার আয়তন অতি অল্প, বাঘের মস্তিষ্ক কমলা লেবুর চেয়ে বড় নয়, চিতার কিন্তু তার চেয়েও ছোট।

একবার একটি চিতা যখন নীচে হতে আক্রমণ করে উপরে উঠে আসছিল তখন তার নাকের উপর গুলি করেছিলাম, তাতে সে নিরস্ত হয়নি, বন্দুকের বাঁনলটি যখন কাঁধের উপর খালাস করলাম তখন সে মরে হুমড়ে পড়ে গেল। মাথার খুলি খুলে দেখা গেল, দেখতে পেলাম গুলি নীচের দিকে নেমে তার চোয়াল দুটো যেন কুড়োলের ঘায়ে সমান করে কেটে দিয়েছে। গুলি যে কত অদ্ভুত ভাবে জন্তুর দেহের মধ্যে পথ করে চলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অতি নরম মেদ মজ্জাও এদের গতি পথে বাধা সৃজন করে।

Smoothbore বন্দুক বাঘ ভালুক শিকারে একেবারেই নিরাপদ নয়। এ Smoothbore আধুনিক গুলি ছররার বন্দুক নয়। এ সস্তা বন্দুক নিয়ে চলা ফেরা ও লক্ষ্য করা সহজ বলে অনেকে Rifle এর চেয়ে এই জাতীয় বন্দুকের পক্ষপাতী। Rifle'এর জন্যে "পাস" (pass) পাওয়া এমি কঠিন ব্যাপার যে অনেকে একমাত্র এই কারণেই যে বন্দুকের "পাস" সহজে পায়, তাই কেনে। বিজ্ঞাপনের জোরে যে সব বন্দুক আপন মহিমা প্রচার করে,তার উপর নির্ভর করে বাঘ ভালুক শিকারের উপযোগী অস্ত্রোয়াস্ত্র কিনতে যাওয়া নিরাপদ নয়। সত্বরে কিম্বা বিলম্বে সমুহ বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি Smoothbore আর Rifle দুই ব্যবহার করেছে, পরীক্ষার পর Rifleকেই শ্রেষ্ঠ পদবী দেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ হিংস্র জন্তু নিধন ব্যাপারে। Rifle যেমন নিশ্চয় আঘাত করে, লক্ষ্যে যেমন অভ্রান্ত থাকে, আর এই অস্ত্র সহায়ে নিজেকে যেমন নিরাপদ বোধ হয়, তাহাতে দুই অস্ত্রের মধ্যে Rifleকেই মনোনীত করে নিতে দ্বিধামাত্র হবার কথা নয়। অন্যটির উপর এমন নিশ্চয় নির্ভর চলে না। মৃগয়াক্ষেত্রে বিপদ যদি বা নাই ঘটে দুঃখ নিরাশা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা।

একটা দুনলা ৪৬৫ Cordite Rifle'এ কিম্বা অন্য কোন বন্দুকে যাতে একই ওজনের গুলি ছোঁড়া যায়, যাতে ৪৮০ গ্রেন দিয়ে সব রকম শিকার চলে, সে রকম বন্দুকের সমকক্ষ আর কোন বন্দুক নয়। এর সঙ্গে যদি দুইনলা 12 bore Royal Nitor Paradox থাকে তাহলে ভাল। যদি বাইসন শিকারের দুরাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ কর তাহলে এই সঙ্গে ৫৭৭ দুনলা কর্ডাইট রাখলে, সমস্ত বিপদ আর নিরাশার হাত এড়াতে পারবে। চিন্‌কারা আর পার্ব্বত্য প্রদেশে হরিণ শিকারের জন্য একটা একনলা Magazine Rifle না হলেই নয়। এর চেয়ে ছোট বন্দুক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই বলেই, তাদের উপর আস্থারও অসম্ভাব। আমি চিরকালই বিশ্বাস করে এসেছি ধাতুর দৃঢ়তা আর ওজনের প্রাচুর্য্যই শেষ রক্ষা করে; অবশ্য এই সঙ্গে স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়মুষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বদা অভ্যাস, নাড়াচাড়া ও ব্যবহার, এই হতে Rifle বন্দুকের নিপুণ প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে। বনে জঙ্গলে যে জ্ঞান অর্জ্জন করেছি, বিপদের মুখে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে যে উপায়ে আত্মরক্ষা করতে শিখেছি, বিপদ এড়াবার পন্থা নির্দ্ধারণ করবার সেই শ্রেষ্ঠ পথ সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

শিকারের Rifle কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার কোন আবশ্যকতা নেই। মাচানে চড়ে কি হাওদায় বসে শিকার করলে তার দরকার হয় না। আর পায়ে হেঁটে যদি শিকার কর তাহলে এভাবে বন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়ার বিপদ আছে। কাঁধে ঝোলে বলে গায়ে পড়ে বাধা দেয়, সেই জন্যে কাঁধে না ঝুলিয়ে হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আমি আমার বন্দুক গুলি এমন করে গড়িয়ে

নিয়েছি, যাতে এসবের আবশ্যক হয় না। একটি মাত্র Rifle'এ এই রকম ঝুালয়ে নিয়ে যাবার ছিদ্র ছিল। একবার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে তার মধ্যে ছোট একটি ডাল ঢুকে এমন সঙ্কট মুহূর্ত্তে বাধা সৃজন করেছিল যে আমি তার পরে সে ছিদ্রের চিহ্ন মাত্র রাখিনে, ঘষিয়ে একেবারে সমান করে নিয়েছিলাম।

বানান করাটা যেমন লেখকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে, বন্দুক নির্ব্বাচনও তেম্নি শিকারীর অভিরুচির উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু Samo Weller'এর নাম বানান করতে হলে যেমন বড় হাতের "W" লেখা ভাল, তেম্নি হাঁস ও স্নাইপ শিকারের সময় তাদের উপযোগী অস্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। আধুনিক হাঁস শিকারের বন্দুক একটি বিশেষ আবশ্যকীয় অস্ত্র। আর আজকালকার দিনে বন্দুক নির্ম্মাতারা এই অস্ত্রটি এমন নিপুণ নির্ভুল উপায়ে চমৎকার করে তৈয়ারি করেছেন যে 4 bore বন্দুক ছুঁড়তে কাঁধে কিছু আঘাত লাগে না। এ বন্দুক আমি অধিক ব্যবহার করিনি, কেমনা হত্যাকাণ্ডকে আমি শিকার মনে করিনে, কিন্তু বড় গুলি ব্যবহার করলে ১৩০ গজ দূরেও হাঁস এতে নির্ঘাত মারা যায় এ বিষয়ে আমি হলফ করতে রাজী আছি। আমার দৈত্য বন্দুকটি এখন আলমাইরায় আরাম শয়নে বহুকাল ধরে সুখে কাল কাটাতে থাকবে। যতদিন না তুমি তার চেয়ে লম্বায় বেড়ে ওঠ, ততদিন তার ছুটি। এই বন্দুক ব্যবহার করতে গিয়ে আমাকে ধাক্কা খেতে হয় দেখে একজন মাঝি আমি যতবার বন্দুক ছুঁড়লাম ততবারই পিছন হতে আমায় সামলাতে চেষ্টা করায়, গুলি লক্ষ্য ছেড়ে বহু দূরে গিয়ে পড়ে একেবারে সে দিনের শিকার পণ্ড করে দিয়েছিল। মাঝির এ অপ্রত্যাশিত প্রীতি ও অনাহূত সহকারিতার ফলে ব্যাপারটির পরিণাম ক্ষতিকর আর হাস্যজনক হয়েছিল।

এই হতে মনে পড়ে গেল আর একবার একজন শিকারী বিশেষ একটা সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমার হাত ধরে টেনে কার্য্য পণ্ড করে দিয়েছিল। এক জ্যোৎস্না রাতে আমি আর K. G B বাঘের প্রতীক্ষায় দুজনায় দুই মাচানে বসে ছিলাম। বাঘকে প্রলোভন দেখাবার জন্যে যে টাট্টু বাঁধা হয়েছিল একটা মস্ত ভালুক ঠিক তারি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঋক্ষ মহারাজ অশ্বতরটির কাণের কাছে দু'তিনবার হুঙ্কার দিলেন। সে কিন্তু ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ির সীমানা ছেড়ে পলায়ন করল না, বরং তাকে ছেড়ে ঠিক আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। শিকারী আমার ডাহিনে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। যদিও আমি আগে হতেই তাকে নড়া চড়া করতে বারণ করে দিয়েছিলাম, তবুও হিংস্র জন্তু শিকারের ভীতি-কর উত্তেজনার মুখে সে অকস্মাৎ আপনার অজ্ঞাতে আমার হাত ধরে টান দিলে, ফলে লক্ষ্য আমার ভ্রষ্ট হয়ে হাতের শিকার ফস্কাল, গুলিটা উদ্ভ্রান্তের মত উধাও হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল। শিকারীটির এই ক্ষিপ্ত ব্যবহারের পর হতে আমি এমন লোকের সান্নিধ্য একেবারে বর্জ্জন করেছি।

শিকারের জোড়জোড় সম্বন্ধে প্রত্যেকের "আপরুচি খানা"—হিসাবে স্বাধীনতা থাকা ভাল। তোমার ভাল লাগাটা অন্যের উপর জোর করে না চালানই ভাল। পোষাক পরিচ্ছদের আকার যাই হকনা তাতে কিছু আসে যায় না, তবে রংটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সে হিসাবে আরামের সঙ্গে অদৃশ্য থাকবার অধিক সুবিধা যাতে ঘটে সেই সুবর্ণ সুযোগ কখনো ছাড়বে না।

আমি নিজের জন্তে এক বিশেষ নমুনার কোট উদ্ভাবন করেছি। তাতে আরাম, শিকার, ভ্রমণ, ঘোড়দৌড়, লম্ফ, খেলা সবই চলতে পারে। আর আমি গৌরব করে বলতে পারি—এ নমুনাকে কেউ হারাতে পারবে না। আমার বড় সঙ্কোচ হত যে পাছে আমাকে কেউ Brougham, Wellington কিম্বা Spencer'এর মত উচ্চাভিমানী মনে করেন। তাই দু একজন ঘনিষ্টতম বন্ধু ছাড়া আর কারো কাছে এ রহস্ত ভেদ করিনি। তাঁরা কিন্তু বেইমানী করে চতুর দর্জ্জির সহযোগে এ নমুনার কোটকে, "কুমুদনাথ কোট" নামকরণ করে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ হিসাবে "দেব শর্ম্মা" লিখতে পারি এতেই আমি পরম পরিতুষ্ট, অন্ত অমরতার দাবী আমার মনের মধ্যে বসতি করেনা। "ডোডো" পাখীর মত ক্রুহাম আজ অন্তর্দ্ধান। ট্রেঞ্চ (Trench) খুঁড়ে কবর দেবার সময় আসবার আগেই Wellingtonএর গোর হয়ে গেছে, Spencer আর ফ্যাসান নেই। পার্থিব কীর্ত্তির পরিণাম এইরূপই হয়ে থাকে। "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে। যদিও পার্থিব সবই নশ্বর, তবুও সৈনিকপরিচ্ছদব্যবসায়ী কোন বিশেষ বিপণিতে যদি যাও তাহলে তারা তোমাকে এই দিব্য পরিচ্ছদ প্রস্তত করে দেবে। আর মৃগয়াক্ষেত্রে এটি যে তোমার বিশেষ কাজে আসবে সে আশ্বাস খুবই দিতে পারি। পারিপাট্যে পাশ্চাত্য, প্রাচুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যে প্রাচ্য নীতির অনুকরণ ও অনুসরণ করেছি। আস্তিনে যতখানি পরিসর ইচ্ছা কর পাবে, আর কোমরবন্ধে বন্ধ যখন কসবে, তখন ক্ষীণমধ্য কিম্বা পৃথু-কটি যাই হওনা কেন সব ধরে তোমায় বীর ছাড়া আর কিছু মনে হবার যোই থাকবে না! তবেই দেখছ মানুষী বুদ্ধি, বহুকষ্টকাতর শিকারীর পক্ষে এমন দৈবী বর আর কি দিতে পারত?

আজ কাল যুদ্ধে, সৈনিক, খাদ্য নয়, ধোঁয়ার সাহায্যে লড়াই করে! ধূমপানই তার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রধান হেতু ও উপায়। কথায় বলে প্রবৃত্তির বশ হওয়াই তাকে দমন করবার প্রধান সাধন। ভাল, একদিন কনকনে শীতের সকালে Regent Street'এ খাতির নদারৎ ভাবে চলতে চলতে একটা muria কিনেছিলাম। বিক্রেতা স্বয়ং এই সৌখীন পদার্থটা মনোনীত করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এই মনোহর পর্ণ পুটের অন্তর নিহিত গোপন মাধুর্য্য সম্ভোগ। চারিদিক নিবাত নিষ্কম্প, বাতাসের একটি শ্বাস পড়ছিল না। কাজেই এই সুগন্ধ তাম্রকূট পত্রের বহ্নি উদ্দীপ্ত ধূম্রের তিল পরিমাণও বায়ু তাড়িত ও অন্যত্র বাহিত হয়ে অপব্যয় হবার কোন আশঙ্কাই ছিল না! আমি দোকানের বাহিরে এলাম। সে চুরুট সম্ভোগ, অভিনব সুখরাজ্যের আবিষ্কার। তবে দুঃখ এই যে সমস্ত সুখের মত ক্ষণিক ও ভঙ্গুর! দেশে ফিরে এসে আবিষ্কার করতে অধিক বিলম্ব হলনা যে আমার দম রাখবার ক্ষমতা কমে গেছে, এবং সেই জন্তেই দু একটা গুলি অযথা রকম লক্ষ্য ছেড়ে অন্যত্র পলাতক হল। যদিও আমি চুরুট পাইপ ছাড়া সিগারেটের পায়ে আপনাকে কখনো বিকিয়ে দিইনি! শিকার করতে হলে স্নায়ুবল আর নিশ্বাসের বায়ুবল দুই রক্ষা করা দরকার। তাই প্রথমটা এই ধূমপান সুখ ও সখ ছেড়ে কিছু অসুবিধা বোধ হলেও অল্পদিনেই এ ত্যাগে অভ্যস্ত হলাম। মনের বল থাকলে কিছুই কষ্টসাধ্য নয়। মনের জোর থাকলে এ দুনিয়ায় কিছুতেই আসে যায় না! কাল ছাড়ব বলে রাখলে অবস্থা কি দাঁড়ায় জান? একজন নাপিত তার দোকানের দুয়ারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, আগামী কল্য বিনা পয়সায় কামান হইবে। সে আগামী দিন কখনো আসেনি, এটা নিশ্চিত। সেই জন্তে, বাছা, তোমার প্রতি আমার উপদেশ ত্যাগ করার চেয়ে অভ্যাস না করাই

ভাল! কড়া পানীয় তাদেরই ভাল যাদের পণ, বাঁচা নয়, মরা! আর সুরা নামক তরল দ্রব্যটি পরিশেষে সর্পের মতই দংশন করে। কথায় বলে দুধ দিয়ে সাপ পোষা, তার পরিণাম ভয়াবহ! আমি বলি প্রাণ বলি দিয়ে পান না করাই ভাল। অতএব সাবধান! এই বায়াহী প্রবৃত্তি হ'তে তফাৎ থেক।

শিকার ব্যাপারে আমি এতদিন রেল ও বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের কাছ হতে সদা সর্ব্বদাই যে সাহায্য ও ভদ্র ব্যবহার পেয়ে আসছি তার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী,—তিনি নিজে দক্ষ শিকারী,—তবু আমি দূর বাংলা দেশ হতে শিকার করতে আসছি শুনে বন-বিভাগের শ্রেষ্ঠ স্থানটি আমার জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখে ছিলেন। তাঁর এই সৌজন্য আমি কখনো ভুলতে পারব না। আর একবার স্বদেশ হতে দূরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী প্রবাসে, বাংলা মুলুক হ'তে শিকার করতে গেছি জেনে,অনাহূত অনেক সাহায্যের প্রস্তাব করে পাঠিয়ে ছিলেন। সে কথাও আমার মনে গাঁথা আছে। আমার মনের অতলে যেমন চতুর ডুবুরি নামাও না কেন বন বিভাগের কর্ম্মচারী-দের আতিথ্যের জন্যে আমার গভীর অশেষ কৃতজ্ঞতার মাপ জোক সে কখনই করতে পারবে না। আমার এ কৃতজ্ঞতা একেবারে অফুরন্ত, খুলে দেখান যায় না বলে বোঝান অসম্ভব। মধ্য প্রদেশের একজন সামন্ত রাজা তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর বনস্থলীতে আমাকে স্বেচ্ছা বিচরণের অধিকার দিয়ে যে বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাও চিরস্মরণীয়। আসামের অপর একজন সামন্ত নৃপতির সহৃদয় আতিথ্যের গুণে আমি শিকারের বহুতর গৌরব নিদর্শনে আমার গৃহখানি সাজাতে পেরেছি, এ সুযোগ না পেলে তা আমার ভাগ্যে ঘটত না। তিনি নিজে অতি নিপুণ শিকারী তাই আমার মনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি এমন সহজ ও সুন্দররূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল।

৩০শে জুন ১৯১৮

আদরের ছেলে মেয়ে,

প্রায় এক বৎসর হয়ে গেল এই চিঠি গুলি আমি লিখতে আরম্ভ করে ছিলাম। করুণা এখন ডাগর হয়ে উঠেছে, জুলুম-বাজ কালিপ্রসাদও জানান দিতে সুরু করেছে যে সেও একটা মানুষ, তাকে আর পিছে ফেলে রাখা চলবে না। সে এখন বাঘ ও চিতা, কৃষ্ণ-সার ও সাম্বর, বাইসন ও মহিষের তফাৎ বেশ বুঝতে পারে। তাই বাকী কথা গুলি চার জনেরই উদ্দেশে বলে, এখনকার মত চিঠি লেখা বন্ধ করব। মুহূর্ত্তের জন্য যদি একটিবার অমর কবি কালিদাসের বনস্থলী-বর্ণনার মধ্যে ফিরে যাবার অবসর হয়, এমন প্রতি ছত্রে তাঁর আশ্চর্য্য লক্ষ্য করবার ক্ষমতা ও লিপিকৌশল দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না!

কিবা চারু গ্রীবা ভঙ্গে ফিরে ফিরে চায় *
একদৃষ্টে মুহুর্মুহু রথটীর বাগে;

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ।

শরপাত ভয়ে মৃগ আকুঞ্চিত কায়,
পশ্চাতের দেহ যেন পাশে পূর্ব্ব ভাগে ॥
শ্রমে আধো খোলা-মুখ, ঝরি তাহা হতে
অর্দ্ধেক চর্ব্বিত তৃণ পড়ে পথে পথে।
কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ, মনে হয় তার
ব্যোম মার্গে গতি তার অল্পই ধরায় ॥

মৃগয়ার প্রশংসা করে দুষ্মন্ত সেনাপতিও যে বলেছিলেন—

মৃগয়ায় মেদোহীন, কৃশোদর কার্য্যক্ষম দেহ
মৃগয়ায় জানা যায় পশুদের ভয় ক্রোধ স্নেহ,
ধন্য সেই ধনুর্ধারী চল-লক্ষ্যে সিদ্ধ হস্ত যার,
কে বলে মৃগয়া দূষ্য, এ বিনোদ কোথা পাবে আর?

এটা খুব ঠিক কথা। সূর্য্যের তেজ-দৃষ্টি পাতে আজ আমার দেহ পাটল বর্ণ, বনের ছায়ার মনের অন্তঃপুর প্রীতিসিঞ্চিত। প্রতি দিন প্রাতে অভিনব আশার উৎসাহে অভিনন্দিত আমার দিনগুলি হতে, অরণ্য বাসের অবসানে যে আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছিলাম আজ তাই তোমাদের সম্মুখে ধরে দিলাম। যথার্থ মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলবেন, বনে বনে বরাহ ভল্লুকের অনুসরণ করে ফিরবার যে আনন্দ, তা জীব হিংসার তীব্র আগ্রহ নয়, জীবধাত্রী ধরিত্রীর সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের মৃদু সুখ-স্মৃতি! জীবনে যৌবনের উজ্জ্বল রসধারা। শোন ব্রাউনিং কি বলেছেন:—

"Oh, our manhood's prime vigour!
Not a muscle is stopped in its playing, nor sinew unbraced.
Oh, the wild joy of living! the leaping fr m rock to rock
The strong rending of boughs from the fir-tree—the cool silver shock.
Of the plunge in a pool's living water—the hunt of the bear,
And the sultriness showing the lion is couched in its lair.

আবার শোন Walt Whitman কি বলেন:—

"এই তো জীবন, সম্পূর্ণ জীবন; বাচ খেলার যে নৌকা জেতে তাতে দাঁড়টানা যেমন জীবন-যেটা পিছে পড়ে থাকে তাতে দাঁড় বাওয়াও তেম্নি জীবন। জীবনের অর্থই হচ্ছে উৎসাহ, প্রাবল্য, ও ঐকান্তিক একাগ্রতা।

এ খেলায় হার নেই, সবই জিত। তারুণ্যের খেলার বর্ব্বরতায় বাধা পেলেই ভয়ানক হয়ে ওঠে নয়ত এ খেলায় লাভের পাল্লাই বেশী—আয়ু বাড়ে, স্নায়ু বাঁচে, বাড়ে বুদ্ধি মন!"

Robert Louis Stevenson'এর এই কয় ছত্র মনের পাতায় ভাল করে,— লিখে রেখো।

"সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে নিয়ত পরিচয়ের মত আর কিছুতে আমাদের বুদ্ধি সংস্কৃত মার্জ্জিত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করতে পারে না। সূর্য্যের উদয়াস্ত দৃশ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মত এমন নিপুণ শিক্ষক আর খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রকৃতি দেবীর যেমন মাধুর্য্যেই তুমি মুগ্ধ হও মনের উপর তার প্রভাব অপরিসীম, প্রত্যক্ষ না হলেও অব্যর্থ!"

তবেঃ—"আজ এই ধনু মোর লভুক বিশ্রাম,
শিথিল হউক ছিলা, তূণ শায়ী বাণ॥" *

সেই সঙ্গে আমিও কিছুকাল বিশ্রাম করি, কি বল? ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীকুমুদনাথ দেবশর্ম্মা।

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত শকুন্তলা কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

সমাপ্ত।

সমাদরের অভাবে এই মধুর পদাবলী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দুই একজন কৃতবিদ্যমহাশয় টীকা প্রভৃতি সহযোগে বিদ্যাপতির পদাবলীর মুদ্রণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যথোচিত পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে এবং মৈথিল ভাষায় অজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহাদিগের হস্তে বিদ্যাপতির দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

অমর কবি বিদ্যাপতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহার গৌরব রক্ষায় যত্নপরায়ণ হন। কাব্যবিশারদ মহাশয় বিপুল পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া মিথিলার নানাস্থানে ভ্রমণ ও বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকট স্বয়ং বারংবার যাতায়াতপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পুঁথির সংগ্রহ করেন। সেই সকল পুঁথি মিলাইয়া বিশুদ্ধপাঠ নির্ণয়পূর্ব্বক বিশদ টীকাসমন্বিত বিদ্যাপতির পদাবলী প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের যখন প্রচার হয়, তখন সকলেই ইহার বিশুদ্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা দর্শনে সবিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির এরূপ সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কাব্যবিশারদের গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পর কেহ কেহ ঈর্ষ্যা প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐরূপ অসার নকলে মূল গ্রন্থের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যাপতির এই সংস্করণে মৃত কবির জীবনী, বংশপরিচয়, কবির হস্তাক্ষরের অনুলিপি, পাঠান্তর প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্য সংস্করণ পাঠের আবশ্যকতা হইবে না; ইহাতে যে প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা মৈথিল কবিতার অর্থ গ্রহণে ও রসাস্বাদনে কাহারও ক্লেশ হইবে না। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

মায়া-কানন।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

যে মাইকেল মধুসূদনের নাম বঙ্গবাসীর সাধনামন্দিরে সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, যাঁহার কাব্যাবলী মধুচক্রের ন্যায় গৌড়জনক নিরন্তর মধুপানে মত্ত রহিয়াছে, সেই কবিকুলচূড়ামণির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক "মায়া-কানন" অল্প মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ছাপা, কাগজ, সমস্তই উত্তম। মূল্য অতি সামান্য ।৵৹ ছয় আনা মাত্র।

মিঠে কড়া।

রাহু রচিত ব্যঙ্গ কাব্য। (সপ্তম সংস্করণ।) কাব্য জগতে যদি তীব্র কশাঘাত দেখিতে চাহেন, কোমলে কাঠিন্য, উজ্জ্বলে আঁধার অমৃতে গরল প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে অভিলাষী থাকেন, তাহা হইলে মিঠে কড়া পাঠ করুন। বর্ত্তমান সময়ের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত সেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কড়ি ও কোমল" পুস্তকের এমন মনোহর অথচ মর্ম্মস্পর্শী রসপূর্ণ অথচ তীব্র ও নির্ভীক সমালোচনা আর কোথাও দেখিতে পাইবেন না। মূল্য দেড় আনা মাত্র। একখানি পুস্তক ভিঃ পিতে প্রেরিত হয় না। তিন বা ততোধিক পুস্তক একত্র হইলে ভিঃ পিতে পাঠান হয়। যাঁহার ১খানির আবশ্যক, তিনি আড়াই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলেই ঘরে বসিয়া পুস্তক পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।